শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট • কলিকাতা

আড়াই টাকা

যাঁরা বড়লোক নয়

তাঁদের হাতে—

প্রবাসীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ কালে পতঙ্গের যে কলেবর ছিল, এখন তাহা সামান্য পরিবর্দ্ধিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

চাঁপদানী
বৈদ্যবাটী
হুগলী
১৫।৩।৫৭

শ্রীপৃথ্বীশ ভট্টাচার্য্য

খ্যাতি জিনিষটা যে সর্ব্বদাই লাভজনক নয় এ কথা মানুষ সাধারণতঃ বুঝিতে চায় না। শচীনবাবুর জীবন কাহিনী সম্বন্ধে যাঁহারা অবহিত তাঁহারা এ কথা স্বীকার করিবেন—খ্যাতি একদিকে যেমন কতকগুলি লোকের অকৃত্রিম স্নেহ ও সহানুভূতিতে অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া দেয়, অন্যদিকে তেমনি আর কতকগুলি লোকের অকারণ অসূয়াও জীবনকে প্রতি ক্ষেত্রে কণ্টকিত করিয়া তুলে।

শচীনবাবু সামান্য মাষ্টার। বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্ম্মশক্তি, সাহিত্যপ্রতিভা প্রভৃতি অনেক কিছুই তাহার মধ্যে ছিল, কিন্তু তবুও কেন যে তাঁহার জীবনে সামান্য ৭০৲ টাকার মাষ্টারী ব্যতীত আর কিছুই জুটিল না এ বড়ই বিস্ময়কর। সকলেই একবাক্যে বলে, শচীনবাবুর মত লোকের পক্ষে এ চাকুরী আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। তাঁহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি সহাস্যে বলেন, গুণ আমার অনেকই ছিল সত্য, সেটা আমিও বুঝি, কিন্তু একটা দোষে সব কিছুই নষ্ট হ'য়ে গেছে।

—সেটা কি ?

—অন্যায়কে অন্যায় বলতে আমার মুখে আটকায় না, আর জেনে শুনে কোন নির্ব্বোধকে বুদ্ধিমান্ বলতে বাধে—এই দোষেই জীবনে উন্নতি হয় নি।

বর্ত্তমানে এ দুটি ভয়াবহ দোষ—এ কথা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। শচীনবাবুর কথার তাই জবাব মিলে না।

*

বড় রাস্তার পাশে, ছোট গলির মধ্যে তাঁহার বাসা। বাসায় তাঁহার স্ত্রী ও একটি পুত্রমাত্র। সংসার একরূপ চলিয়া যায়, সত্তর টাকার উপরেও ছেলে পড়াইয়া কিছু জোটে। বয়স তাঁহার তিরিশ—যদিও চাকুরীর ধর্ম্মগুণে প্রৌঢ় বলিয়াই মনে হয়। চার বছরের পুত্র লাট্টু যথেচ্ছ খেলিয়া বেড়ায়, পতিব্রতা পত্নী মীরা সেবাযত্নে স্বামীকে খুশী করিয়াছে বলা চলে। ছোট্ট গৃহে শান্তিপ্রিয় প্রাণীগুলি পাখীর মত আনন্দে দিন কাটাইয়া দেয়—কিন্তু জগতের নিয়ম যে নীড় ঝড়ে ছিন্নভিন্ন হয়, পক্ষিণী, পক্ষীশাবক মাটিতে পড়িয়া যন্ত্রণার ডানা ঝাপটায় দিগন্ত বেদনার্ত্ত করিয়া দেয়—ঝড়ের মুখে নীড়ের কুটা ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়। এ ঝড় কখন কোন্ দিক দিয়া কেমন করিয়া আসে তাহা ধারণাতীত, কিন্তু তবু তাহা আসে এবং অনিবার্য্য ভাবে।

ভারতের ভাগ্যাকাশেও এমনি ঝড় উঠিয়াছে—অন্তরাগ্নির উদ্গারে কত গৃহ কত প্রাণ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে—নীরবে নিভৃতে লোকচক্ষুর অগোচরে কত অশ্রু ঝরিয়া পড়িয়াছে তাহার ইতিহাস কে জানে, কে বা জানিতে পারে। কিন্তু নির্ম্মম বিধাতার রুদ্ররোষ শান্ত হয় নাই—আরও কত প্রাণ আহুতি পাইলে সে রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত হইবে কে জানে। শচীনবাবু বিশ্বাস করিতেন, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতাই সফলতার পরিপোষক—তাই নীরবে এই আত্মাহুতি দেখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু এই অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িবার মত সাহস তাঁহার মধ্যে আর অবশিষ্ট ছিল না।

*

তাহার ছাত্র নয় এরূপ অনেকেই শচীনবাবুকে শিক্ষকরূপে সমীহ ও শ্রদ্ধা করিত, এই ক্ষুদ্র মহকুমা শহরেও তাহার সংখ্যা নেহাত কম নয়।

সত্যদাস তাহাদেরই একজন, অত্যন্ত বিনয়ী, নেহাত ভাল মানুষ—যাহাকে আধুনিক ভাষায় গোবেচারী বলা যায়।

রবিবারে ঘুম হইতে উঠিতে স্বভাবতঃই বিলম্ব হয়। শচীনবাবু তাই দেরী করিয়া উঠিয়া দেরী করিয়াই চা খাইতেছিলেন। সত্য প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। শচীনবাবু বলিলেন, বসো সত্য। একটু চা খাবে ত?

—থাকে দিন। তৈরী করবার দরকার নেই সার। এই মাত্র খেয়েই বেরিয়েছি আপনাকে সংবাদটা দিতে।

—কি?

—আমি পাশ করেছি, ডিষ্টিংসন পেয়েছি। এমন হবে কল্পনাও করি নি। শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, এমন সংবাদটি খালি হাতে আনতে হয়। যাক আমিই মিষ্টিমুখ করাই।

অন্দর হইতে কয়েকটি মিষ্টি ও সিঙ্গাবা সহ চা আসিল। সত্য খাইতে খাইতে প্রশ্ন করিল, এখন কি করব সার?

—চাকুরী। বিবাহ এবং সংসার করা—

—সে ত সকলেই করে। চাকুরী করতে ইচ্ছে করে না—

—তবে ব্যবসা কর। এ সব উপদেশ রোজই দু'দশবার দিয়ে থাকি, ওসব মুখস্থই আছে। ব্যবসা কিসের তাও বলতে হবে?

—না স্যার। সত্য একটু হাসিয়া কহিল, আমার এমন ত অভাব নেই, সামান্য টাকার জন্য কেন বৃথা শ্রম করব?

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বিয়ে করবে না, চাকুরি করবে না, ব্যবসা করবে না, টাকা রোজগার করবে না, তবে করবে কি বলতে চাও?

সত্য একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, একটু লিখতে চাই, আপনি যদি আমাকে একটু দেখিয়ে দেন।

শচীনবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন, সাহিত্যিক হতে চাও?

বেশ, বড় চমৎকার পথ বাৎলেছ, অর্থাৎ পেট ভরে খেয়ে বেঁচে থাকবার ইচ্ছেটা একেবারেই নেই। না থাক—কিন্তু আর যাই কর অমন দুর্ম্মতি যেন না হয়। নেহাত ওটা বায়ুভুকের ব্যবসা, তবে সখ করে দু'দিন লিখলে—সে ভাল।

সত্য বলিবার একটা কিছু পাইয়াছে এমনি ভাবে বলিল, তা ছাড়া কি আর? শরৎচন্দ্র কি রবীন্দ্রনাথ হতে চাওয়ার ধৃষ্টতা নেই।

শচীনবাবু বলিলেন, বেশ তা লেখো, দেখে দেবো। যখন অবসব আছে—

সত্য একটু চিন্তা করিয়া কহিল, ঠিক তা বলছিনে স্যার। যদি একটা সাহিত্য-সমিতি করা যায় তবে সেখানকাব আলাপ-আলোচনা শুনে আমরা শিখব। ধরুন আমাদের শিক্ষকগণ আছেন, গার্লস্কুলেব ওঁবা আছেন, উকিলদেব অনেকে আছেন এবং অফিসাবদেরও অনেকে আছেন। সাহিত্যসেবী না হলেও সাহিত্যবসিক লোকের অভাব নেই। আপনি যদি একদিন ডাকেন তবে একটা সমিতি গঠিত হতে পাবে।

—আমি ডাকলে তাঁরা আসবেন কেন?

—আসবেন। আপনাকে সকলেই মনে মনে শ্রদ্ধা কবেন।

—যদি না আসেন তবে অপমানটা ত হবে।

—হয় হবে! চুবি ত করেন নি—এটুকু আপনি না করলে কে কববে?

শচীনবাবু হাসিলেন, অর্থাৎ অপমানটুকু আমি ছাড়া আব কে হবে?

সত্য বিড়ম্বিত হইয়া চুপ করিল। শেষে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, তা নয় স্যার, যদি কেউ এ সমিতি গঠন করতে পারে ত আপনিই পারবেন, অতএব আপনাকেই মান অপমান যা হয মাথা পেতে নিতে হবে।

—যদি না করি।

—কারও কোন ক্ষতি নেই, কেবল আমাদের মত কযেক জন লোক আপনারা থাকতেও বঞ্চিত হব।

—অর্থাৎ তোমাদের সুবিধার জন্যে আমাকে অপমানিত হতে হবে।

সত্য হাসিয়া কহিল, নিজের জন্যে ত নয়, পরের জন্যে। ওরূপ ত আপনি বহুবারই জীবনে হয়েছেন।

শচীনবাবু প্রশংসাবাদে একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, এটা একটা কথার মত কথা বলেছ। পরের জন্যে অপমানিত হওয়া চলে। যাক, ভেবে দেখি, আমাদের মহলে কথাটা ফেলে দেখি কি বলেন সকলে, যদি সম্ভব হয় তবে করবই।

—হাঁ, এর জন্যে আমরা ছেলেদের একটা পাঠাগারও করেছি। সেখানে কিন্তু আপনাকে মাঝে মাঝে যেতে হবে কিছু বলতে।

শচীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, অর্থাৎ বি-এ পাশ করার পর তোমার খেয়াল হয়েছে যে আমাকে সুস্থ চিত্তে আর থাকতে দেবে না এই ত! রবিবারটা বিশ্রাম ছিল সেটা যাতে আর না থাকে, এর জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ।

—সত্যি তাই। আপনার অনেক কাজ আছে, আপনার ঘুমোবার পর্য্যন্ত সময় নেই।

শচীনবাবু স্বভাবসুলভ হাসিতে কথাটার গুরুত্ব কমাইয়া দিয়া কহিলেন, হ্যাঁ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলেই ঘুমোবে, আর আমাকে রেসের ঘোড়ার মত ছুটতে হবে।

সত্য হাসিল। একটু চিন্তা করিয়া কহিল, তা হলে কবে সভা ডাকছেন?

—ডাকব, দেখি ভেবে চিন্তে।

—সবাইকে ডাকবেন কিন্তু। হাকিম মহল, উকিল মহল, গার্ল স্কুল—

শচীনবাবু কহিলেন, শেষেরটা ডাকতে পারব না, তাঁরা আসবেনও না। তা ছাড়া শুনেছি হেড মিস্ট্রেস বড্ড বদরাগী। না এলে খামকা অপমান, দরকার কি?

সত্য কহিল, না স্যার। আপনি ডাকলে আসবেনই।

—তোমরা যে চোখে দেখ, সে চোখে তিনি ত দেখেন না। বিশেষতঃ আমি সামান্য মাষ্টারমাত্র, তিনি হেড মিষ্ট্রেস, আমার আহ্বানটা কি স্পর্দ্ধা বলে বিবেচিত হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

—না। আপনি তাঁকে জানেন না, আপনাকে তিনি সত্যিই শ্রদ্ধা করেন। আপনাকে চিনবার জন্যে কয়েকদিন নদীর ধারেই বেড়াতে গেছেন।

—তার মানে ?

—হ্যাঁ, আমার কাছে বলেছেন তিনি। এখানে এসে আপনার নাম শুনে আপনাকে দেখবার কৌতূহল হ'য়েছিল। শুনেছেন আপনি রোজই নদীর ধারে বেড়াতে যান তাই তিনিও গিয়েছেন কিন্তু চিনে উঠ্‌তে পারেন নি।

—তুমি তাকে জানো।

—হ্যাঁ। আমার কাছেও বহু প্রশ্ন তিনি করেছেন। আপনার ভক্ত ব'ললেও অত্যুক্তি হয় না। আপনার নাম তিনি অনেক আগেই জান্‌তেন। আপনার আহ্বানে তিনি খুবই উৎসাহিত হবেন।

শচীনবাবু ক্ষণিক চিন্তা করিলেন। পরে কহিলেন, আচ্ছা, সামনের রবিবারে তোমাকে যা হয় জানাবো।

সত্য প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শচীনবাবু কহিলেন, আমাকে বাজার ক'রতে হবে হে। আমিও উঠি।

*

শচীনবাবু, সুরেনবাবু ও রমণীবাবু তিনজনেই শিক্ষক কিন্তু একই স্কুলের নয়। তথাপি তিনজনের মাঝে কোথায় যেন একটা সৌসাদৃশ্য ছিল তাই তাঁহারা সাধারণতঃ একসঙ্গেই আড্ডা দিতেন। কালে কালে

এঁরা তিনজনেই 'সাণ্ডে ক্লাব' নামে পরিচিত হইয়া উঠিলেন। প্রতি রবিবারে সুরেনবাবুর বাসায় বাজারান্তে সকলে সমবেত হইতেন এবং সপ্তাহের কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ও একঘেয়ে কাজের পরে সকলে মন খুলিয়া আলোচনা করিতেন—কোনদিন সাহিত্য, কোনদিন রাজনীতি, কখনও স্থানীয় রাজনীতি, কখনও নির্জ্জলা পরনিন্দা, কখনও বা স্ত্রীঘটিত ব্যাপারের সরস সমালোচনা হইত। মাষ্টারী জীবনের মাঝে রবিবার সকালের এই আড্ডাটুকুই ছিল অনাবিল আনন্দে পূর্ণ। কেবল তাহাই নহে অনেক সময়ে দুরূহ সমস্যার সমাধানও এই আড্ডা হইতে আসিত।

সেদিন শচীনবাবু যাইয়াই বলিলেন, সুরেনবাবু, সত্য ধরেছে একটা সাহিত্য সমিতি ক'রে সাহিত্যালোচনা ক'রতে হবে। এ প্রস্তাবটা সাণ্ডে ক্লাবে ফেল্‌তে চাই—সেখানে যদি পাশ হয় তবে—

সুরেনবাবু ব্যঙ্গ করিয়া প্রশ্ন করিলেন, কে কে সভ্য হ'তে পারবে—

—সকলেই। মানব হোক্ মানবী হোক্—

সুরেনবাবু কহিলেন, শেষেরটি যদি থাকে, আর একটু জলযোগের বন্দোবস্ত থাকে তবে আমি সভ্য হ'তে এখনই প্রস্তুত।

রমণীবাবু খেদোক্তি করিলেন,—এতই যদি থাক্‌লো তবে কি একটা গান কি একটু সেতার এস্‌বাজ বাজনা থাকবে না।

শচীনবাবু কহিলেন, থাক্‌বে, আপনাদের আজ্ঞা হ'লেই থাক্‌বে।

সুরেনবাবু কহিলেন, আমি ঘড়ি পেন সব বিক্রি করে সাহিত্য সমিতিতে দেব।

রমণীবাবু পরিহাস করিলেন,—অত বীরত্ব ভাল নয়। শেষে পারুলের মা শুন্‌তে পেলে মাছ কুট্‌তে হবে।

সকলেই হাসিলেন। মাছ কুটিবার একটু ইতিহাস আছে। সুরেনবাবু একদিন রবিবারে অনুপস্থিত ছিলেন। তাহার কন্যা পারুল আসিয়াছিল, তাহাকে প্রশ্ন করিতে সে নাকি বলিয়াছিল যে, বাবা মাছ কুটিতেছে আজ

আসিবে না। সেই অবধি সুরেনবাবুর অদৃষ্টে মাছ কুটিবার কাপুরুষতা চিরকলঙ্ক হইয়া আছে। অবশ্য সুরেনবাবু বলিয়া থাকেন, ওটা রমণীবাবুর নেহাতই স্বকপোল কল্পিত মিথ্যা ভাষণ।

চা পানান্তে সমিতির কথাটা গুরুত্ব লাভ করিল। সুরেনবাবু কহিলেন, মন্দ কি, মাষ্টারী জীবনে বৈচিত্র্য বলিয়া কিছু ত নাই, যদি তাহার মাঝে একটু সরসতা আসে মন্দ কি?

রমণীবাবু কথাটা সমর্থন করিলেন। শচীনবাবু বলিলেন, গার্ল স্কুল কি বাদ যাবে?

সুরেনবাবু সহাস্যে কহিলেন, হতেই পাবে না। ডাক্‌লে যদি না আসে তবে সেটা তাদের অভদ্রতা, আপনার কি? বি, এ, পাশ ক'রেও যদি মিশতে না পাবে তবে বৃথা তাদের লেখাপড়া শেখা।

যাহাই হউক সমিতি প্রতিষ্ঠার কথাটা সভায় একরূপ স্থিরীকৃত হইয়া গেল।

*

শচীনবাবু তবুও ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, অকারণ একটি ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে করিয়া লাভ কি? জগতেরই বা কি উপকারে আসিবে?

কিন্তু সত্য ফেউয়ের মত পিছনে লাগিয়া আছে, অবশেষে এক দিন নিরুপায় হইয়াই শচীনবাবু একটা বিজ্ঞপ্তি দিলেন, এবং ইস্কুলে দপ্তরী মারফত তাহা প্রচারিতও হইল। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শচীনবাবুর মনটা শঙ্কাকুল হইয়া উঠিল, অন্য কেহ আসুক আর নাই আসুক গার্ল স্কুলের কেহ যদি না আসে তবে এ প্রত্যাখ্যানের কত কদর্থ ও অপব্যাখ্যা হইবে কে জানে! মাষ্টারী জীবনের একঘেয়ে গড্ডালিকা ধারার মাঝে তাঁহার মনটা যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, অন্ততঃ কয়েকজন আধুনিক শিক্ষিতা

তরুণীর সঙ্গে আলাপ হইতে পারে এ আশাটাও অন্তরকে অকস্মাৎ যেন রঙীন করিয়া তুলিয়াছিল।

অতীত যৌবন! সেই হাস্যোজ্জ্বল দিনগুলির ভুলে যাওয়া স্বাদ হয়ত আর একবার পাওয়া যাইতে পারে।

সেদিন সভার দিন।

শচীনবাবু শূন্য স্কুলের একখানা চেয়ারে বসিয়া সভাস্থলের চেহারাটি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, যদিও তেমন কিছু নয় তথাপি ভদ্রস্থ বলা যাইতে পারে। টেবিলে বনাত দেওয়া, চেয়ারগুলিও কুশান চেয়ার। হেড মিষ্ট্রেস্ মিস্ রায় যদিই আসেন তবে—

শচীনবাবু সন্দেহে বার বার দোতুল্যমান চিত্তে রাস্তার দিকে চাহিতে-ছিলেন। একখানি লাল শাড়ীতে ঢাকা শুভ্র একখানি দেহ ধীরে ধীরে সেই দিকেই আসিতেছে।

শচীনবাবু উঠিয়া দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন, আসুন।

—অনেক আগে এসে পড়েছি নাকি, আর কেউ আসেন নি?

—বসুন, বাঙালীর সভা ত? আধঘণ্টা বাড়তি ধরে রাখাই হয়।

মিস্ রায় বসিয়া দপ্তরীকে বলিলেন, তুমি যেয়ো না কোথায়ও।

শচীনবাবু কহিলেন, ধন্যবাদ আপনাকে। আমার মত ব্যক্তির আমন্ত্রণে আপনি এসেছেন এটাকে সৌভাগ্য বলে মনে করি!

—আপনার বিনয় প্রশংসাযোগ্য, তবে আসব না মনে করে যদি নিমন্ত্রণ করে থাকেন সেটাও ত ভাল নয়।

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন,—সে ত সত্যিই, আসবেন ভাবলেও ভাল হ'ত না, আসবেন না ভাবলেও ভাল হয় না।

মিস্ রায় হাসিলেন, অতিথিগণ একে একে আসিতেছিলেন। শচীনবাবু বারান্দায় দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখেন, মিস্ রায়ের বর্ণটা জাপানী

মেয়েদের মত ফর্সা। কিন্তু দূর হইতে যেমন সুন্দর দেখায় কাছে যেন ততটা নয়। নাক, মুখ, চোখ সবগুলি যেন ঠিক মানানসই নয়, তবুও সুন্দর তন্বী ক্ষীণ দেহ। শাড়ীর আভায় মুখখানা গোলাপী হইয়া উঠিয়াছে, অজানা একটা সৌরভ ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

একে একে সভাস্থল পূর্ণ হইয়া উঠিল।

তিন জন মহিলা, এক জন অফিসার অর্থাৎ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কয়েকজন উকিল, বাকী সবই মাষ্টার। আর এক জন উৎসাহী স্কুল ইনস্পেক্টরও আসিয়াছেন। বৃদ্ধ উকীল বরদাবাবু সভাপতিব আসন গ্রহণ করিলেন।

সত্যও তরুণ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে সভায় উপস্থিত ছিল, কিন্তু কোন আলোচনায় যোগ দেয় নাই।

সমিতির উদ্দেশ্য প্রভৃতি লইযা আলোচনা চলিতেছিল। ববদাবাবু হঠাৎ বলিলেন, যিনি আমাদের ডেকেছেন তাঁর নিশ্চযই একটা পরিকল্পনা আছে, তাঁর পরিকল্পনাটি শুনে তার আলোচনা কবলেই বোধ হয় ভাল হয়।

সকলের অনুরোধে শচীনবাবু কহিলেন, হ্যাঁ, আমি একটু ভেবে রেখেছি। আদর্শ হবে—জ্ঞান-বিনিময়; আমরা সকলেই কিছু কিছু হয়ত জানি, সভায় পরস্পর সেই জ্ঞান বিনিময় হবে। একজন কোন বিষয সম্বন্ধে লিখলেন বা বললেন তাই নিয়ে আলোচনা হ'ল—শেষে চা ও জলযোগান্তে সভা ভঙ্গ হ'ল। এ ছাড়া মাঝে মাঝে উৎসব হবে সেদিন একটু গান বাজনা আবৃত্তি হ'ল। তবে আমার মতে সভ্য-সংখ্যা বিশের বেশী হওযা বাঞ্ছনীয় নয়, কারণ যা উচ্চাঙ্গের তা কোন দিন সকলের জন্য নয়। তা ছাড়া সমিতির অধিবেশন কেউ নিজের বাসায়ও আমন্ত্রণ করতে পারেন, সেখানে বিশের বেশী সভ্য হলে নিমন্ত্রণ করা সম্ভব হবে না। সমিতির একটা খরচা আছে—পিওন ও জলযোগের। আট আনা

চাঁদা হলেই চলতে পারে আশা করা যায়। এই মোটামুটি আমার পরিকল্পনা।

আলোচনা চলিতেছিল—সভ্য কাহারা হইতে পারে?

শচীনবাবু বলিলেন, সমবেত সকলের মতে যাঁরা উপযুক্ত তাঁরাই হবেন।

যাহাই হউক, সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল এবং শচীনবাবুকেই সম্পাদকতা গ্রহণ করিতে হইল। স্থির হইল—আগামী শনিবারেই প্রথম অধিবেশন হইবে। স্কুল ইনস্পেক্টর হরেনবাবু প্রথম প্রবন্ধপাঠের ভার গ্রহণ করিলেন। ইতিমধ্যে ইচ্ছুক সভ্য ও সভ্যাদের নাম সম্পাদককে জানাইতে হইবে যাহাতে শনিবারে তিনি সকলকেই সংবাদ দিতে পারেন। প্রাথমিক ব্যয়ের জন্য সভাক্ষেত্রেই দশ টাকা চাঁদা উঠিয়া গেল।

*

শচীনবাবু একা একাই বাড়ী ফিরিতেছিলেন।

মনটা আনন্দে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল—প্রথমতঃ তিনি অকৃতকার্য্য হন নাই, দ্বিতীয়তঃ জীবনের কোন্ অতীতের একটা রোমাঞ্চকর অধ্যায় যেন আবার ফিরিয়া আসিতে চাহিতেছে অনুমান করিলেন। মিস্ রায় তাঁহার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন নাই, অধিকন্তু তিনি যথেষ্ট উৎসাহ দেখাইয়াছেন। মাষ্টারীর জীর্ণতার মাঝে যৌবনশ্রীর স্পর্শ তাঁহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, মনে হইতেছিল মৃত প্রাণে যেন স্পন্দন ফিরিয়া আসিতেছে। যষ্টিভারাক্রান্ত জীর্ণ বৃদ্ধ তরুণ-তরুণীর প্রগল্ভ ক্রীড়া সতৃষ্ণ নয়নে দেখিয়া যেমন একটা অব্যক্ত আনন্দ পায় শচীনবাবুর মনও যেন তেমনি একটা অনুভূতি লাভ করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া শচীনবাবু স্ত্রী মীরার উদ্দেশ্যে কহিলেন, একটু চা দাও ত গো—

—এখন ভাত খাবে না ?

—না।

মীরা চা লইয়া উপস্থিত হইল। শচীনবাবু বলিলেন, ব'সো।

চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু মীরাকে দেখিতেছিলেন—সে যৌবনের শ্রী যেন চলিয়া গিয়াছে। দেহের সে সুঠাম সৌষ্ঠব নাই, মাতৃত্বে দেহ যেন যৌবনকে হারাইয়াছে। যৌবনের প্রসাধনেব রেশও আজ নাই। সংসারেব মাঝে মীরা যেন আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

মীবা কহিল, অমন করে কি দেখছ ?

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, তোমার কি হয়েছে বল ত? চুল বাঁধা নেই, একটু ভাল কাপড পবা নেই, মুখে একটু পাউডাব দেওয়া নেই—

—থাক্, বুড়ো বয়সে তোমায় আব বঙ্গ করতে হবে না।

—বুড়ো হয়ে গেছ নাকি ?

—তা ছাড়া কি ? এখন সেজে গুজে বেডালে লোকে হাসবে না ?

শচীনবাবু পরিহাসের সুরে কহিলেন, আমার মনটা ত বুড়ো হয নি। তোমাকে যে তেমনি করেই দেখতে ইচ্ছে করে—

মীবা হাসিল। হয়ত ভাবিযা থাকিবে তাহার স্বামীর ছেলেমানুষি যায় নাই। কহিল, চুল কি বাঁধবার যো আছে, তোমার ছেলে অমনি বায়না ধববে বেড়াতে চল। চুল বাঁধলেই ভাবে বেড়াতে যাবো।

—লাট্টুকে ফাঁকি দিতে গিয়ে আমাকেও দিচ্ছ যে !

মীরা সহাস্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ভীমরতি হয়েছে তোমার। হঠাৎ এমন হ'ল কেন ? কোথায় গিয়েছিলে আজ ?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মীরা চলিয়া গেল।

শচীনবাবু একটা সিগারেট ধরাইয়া বসিয়া রহিলেন—চোখের সামনে

যেন স্বপ্নের রঙীন ছবি ভাসিয়া উঠে। সন্ধ্যার পূর্ব্বে, জ্যোৎস্না রাত্রে নদীর ধার দিয়া তরুণীরা বেড়াইয়া বেড়ায়—ওপারের দিগন্তে পাণ্ডুর চাঁদ আঁখি মেলিয়া চাহিয়া থাকে। মিস্ রায়ও মাঝে মাঝে বেড়াইতে যান—প্রশান্ত নদীতীরে চন্দ্রালোকে বসিয়া কেহ বা গান ধরে—সুদূরের আকাশপটে ভাসিয়া উঠে কত স্বপ্ন।

মীরা ডাক দিল,—খেতে এস, ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

শচীনবাবু উঠিয়া গেলেন। খাইতে বসিয়া দেখিলেন উঠানে চাঁদের আলো পড়িয়াছে। কহিলেন, মীরা, বর্ষায় নদী থৈ থৈ করছে, চল আমরা বেড়িয়ে আসি।

মীরা হাসিয়া কহিল, লাট্টু যদি ওঠে—

—ও ঘুমুলে ত আর সহজে ওঠে না।

মীরা পুনরায় কহিল, যদি তোমার ছাত্রেরা দেখে ফেলে।

—ফেলুক! কি হবে তাতে।

—তুমি কি কিছু খেয়েছ আজকে? তোমার হ'ল কি?

শচীনবাবু হাসিলেন। কোন জবাব দিলেন না—কে যেন আজ যৌবনের রসসুধা তাঁহাকে আকণ্ঠ পান করাইয়া দিয়াছে।

*

শনিবারে অধিবেশন হইবে। হাইস্কুলের শিক্ষকদিগের বসিবার ঘরে—

শচীনবাবু সমস্তই প্রস্তুত রাখিয়াছিলেন, সেজন্য ছুটাছুটি তাহাকে করিতে হইয়াছে। শুক্রবার সকালে সত্যদাস আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

শচীনবাবু পরিহাস করিয়া কহিলেন, বেশ বাবা সত্য, বঁড়শীতে গেঁথে দিয়ে এখন মজা দেখছো—না?

সত্য হাসিল, কহিল, সে কি স্যার?

—সম্পাদকতাটা ঘাড়ে চাপালে এখন আমি ছুটোছুটি করি, কোথায় ভেস্, কোথায় ফুল, কোথায় চা'র দোকান। যাহোক উপকারটা যথেষ্টই করেছ। তোমাদের ত টিকিটাও দেখবার যো নেই।

—সেই জন্যেই ত এসেছি। এ সব জোগাড় ক'রতে ত একঘণ্টা, আপনি ব্যস্ত হবেন বলেই ত একদিন আগে এসেছি। এ সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন।

—হ্যাঁ, ব'সে থাক্‌বো কার ভরসায়।

—যাক্, ভবিষ্যতে আপনাকে কিছু ক'রতে হবে না, সভার আগের দিনে এসে সব ব্যবস্থা ক'রে যাবো। আপনি এত ব্যস্ত হবেন তা'ত জানি না।

যাহা হউক সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অন্যান্য আলোচনার পর সত্যদাস কহিল, স্যার, দিদি কি বলেছেন জানেন ?

—দিদি ?

—হ্যাঁ, হেড মিষ্ট্রেস্। তিনি বল্‌লেন, এখানে এসে একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন তবুও ঐ একটা দম ছাড়বার উপায় পাওয়া গেল। আরও বল্‌লেন, সামনের বৈঠকে আপনার কিছু শুন্‌তেই তিনি ইচ্ছুক।

অন্যান্য আলোচনার পরে সত্য চলিয়া গেল।

কাল সভা। শচীনবাবু মনে মনে তাহার জন্য বেশ যেন একটা আগ্রহ ও আনন্দ বোধ করিতেছিলেন। তরুণী মহিলারা পাঁচজন আসিবেন, আলাপ আলোচনা হইবে, পরিচয় হইবে! জীবনে এমন পরিচয় ত তাঁহার যথেষ্ট হইয়াছে তবুও এমন একটা অনুভূতি কেন মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে, অধিকন্তু তিনি বিবাহিত, পিতা। কামনা তাহার মাঝে আজ মৃতুতা লাভ করিয়াছে। আপনার মনের প্রতি চাহিয়া শচীনবাবুর বিস্ময় বোধ হয়। সুপ্ত এই আগ্রহ তাহার মাঝে কোথায় লুকাইয়া ছিল, কেমন করিয়া ছিল। তিনি ভাবেন—মানুষ যৌবনের পূজারী, যৌবনকে সে আঁকড়িয়া

ধরিতে চায়। আজ বিগত যৌবনে জীবন উপবাস-ক্লিষ্ট তাই সে তাহাকে পরের মাঝে ভোগ করিতে চায়, আপনার মাঝে সে হারাইয়াছে বলিয়া। শচীনবাবু বিচার করিয়া দেখিলেন—তরুণীকে সে মন চায় না, তাহার তারুণ্যকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতে চায়।

*

শনিবার। শচীনবাবু পূর্ব্বেই সত্যকে লইয়া সভাস্থলে অপেক্ষা করিতেছিলেন। একে একে সকলেই আসিলেন। মিস্ রায় দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া কহিলেন, নমস্কার শচীনবাবু। দেরী হয়েছে বলে আগেই মাপ চাচ্ছি—

প্রাথমিক পরিচয় ও আলাপ-আলোচনা হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। হরেনবাবুর লিখিত "শরৎ সাহিত্যের উপকরণ" প্রবন্ধ পঠিত হইবার পবে সেই প্রসঙ্গে আলোচনা আরম্ভ হইল।

মিস্ বায সহসা বলিলেন, আমাদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট থেকে এ সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনতে চাই।

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, আপনারা চাইবেন তা জানি, কিন্তু আমাব ভাণ্ডারে কুলোবে কি ?

যাহা হউক, শচীনবাবু সংক্ষিপ্ত একটু আলোচনা করিলেন, কিন্তু উপস্থিত সকলেই তাঁহার দৃষ্টির গভীরতা ও তীক্ষ্ণ সাহিত্যবোধের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইল, লোকটি কেন মাষ্টারী করিয়া জীবনটার অপচয় করিতেছে !

মিঃ সেন তারিফ করিবার জন্যই ব্যঙ্গ করিলেন,—শচীনবাবুর কথা শুনে এইটুকু বুঝলাম শরৎ-সাহিত্যটা আমরা বুঝি নি।

শচীনবাবু জবাব দিলেন, অর্থাৎ আমার জবানের দোষে সোজা জিনিষ কঠিন হয়ে গেল, এই ত ! মাষ্টারীটা আর থাকবে না দেখছি। মিঃ সেনকে সেজন্য দায়ী করা চলবে, অন্ততঃ আংশিক ভাবে ত বটেই।

চা আসিল। সভান্তে জলযোগপর্ব্ব আরম্ভ হইতেই শচীনবাবু উঠিয়া বলিলেন, রবীন্দ্র-মৃত্যুবার্ষিকী আগতপ্রায়। সামনের অধিবেশনে আমরা কবিগুরুর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করতে চাই। এ সম্বন্ধে সকলে অবহিত হোন, আমার প্রস্তাব সেদিন রবীন্দ্র-সঙ্গীত, কবিতা-আবৃত্তি ও কাব্যালোচনা হবে।

আমাদের সভ্য ও সভ্যাদের অনেকেরই বদান্যতা ও অতিথিবাৎসল্যের খ্যাতি আছে। একথা সকলেই জানেন, তার মধ্যে বিশেষ করে মিষ্টার সেনের বৈঠকখানায় ও মিস্ রায়ের স্কুলে অতিথিবাৎসল্য দেখাবার মত যথেষ্ট স্থান আছে। অতএব আমরা আশা করি তাঁদের দানশীলতা ও মহানুভবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁরা সভাস্থ অন্য সকলকে অনুপ্রাণিত করবেন।

মিস্ রায় হাসিয়া কহিলেন, প্রথমেই আমাকে।

—জগতে বহু লোক আছে যারা প্রথম স্থান অধিকার করবার জন্যেই প্রাণপাত করছে, কিন্তু স্বেচ্ছায় সে শ্রেষ্ঠত্ব হাতছাড়া করাটা—

মিষ্টার সেন বাক্যের শেষাংশ পূরণ করিলেন, কোনক্রমেই উচিত হবে না। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নয়।

অনেকেই হাসিয়া উঠিলেন।

মিস্ রায় কহিলেন, ব্যাপারটা ব্যয়সাপেক্ষ বলেই ভয়। যা হোক্ আমাকে সাহায্য করতে হবে কিন্তু শচীনবাবু।

শচীনবাবু কহিলেন, সর্ব্ববিধ উপায়ে সাহায্য করতে প্রস্তুত, কেবল ব্যয়সাপেক্ষতা ব্যতিরেকে।

হরেনবাবু কহিলেন, বলা বাহুল্য মাত্র। অতএব আগামী অধিবেশন মিস্ রায়ের ওখানে হইবে, স্থির রইল।

সেদিনের মত সভাভঙ্গ হইল। সভার আবহাওয়ায় সকলে সন্তুষ্ট মনেই ফিরিয়া আসিলেন।

*

রাত্রে মীরা প্রশ্ন করিল, তোমাদের কিসের সভা হ'ল ?

—সাহিত্য সভা ।

—গার্ল স্কুলের থেকে কে-কে গিয়েছিল ?

—শচীনবাবু নামগুলি মুখস্থ কবিতার মত বলিয়া গেলেন। মীরা কহিল, ও বাবা, এই জন্যেই রাত্রে ঘুম নেই। সাহিত্য করবে তার আবার সভার দরকার কি ?

—বল কি ? সেখানে যারা এসেছিল তারা মনটাকে কেমন করে দিয়েছে তা যদি বুঝতে—দেখো আজ রাত্রে পঞ্চাশ পৃষ্ঠা লিখে ফেল্‌বো ।

মীরা কহিল, যাক্। জ্যোছনায় বেড়াবার লোকত জুটলো, এখন লাট্টুকে আর একা একা শুয়ে থাক্‌তে হবে না ।

—হ্যাঁ, তোমার জ্যোছনায় বেড়াতে বেড়াতে পায়ে ফোস্কা হ'য়ে গিয়েছে ।

মীরা চলিয়া গেল। সম্ভবতঃ ভাত বাড়িতে। শচীনবাবুর মনে হইল, আজ কল্পনার জ্যোৎস্নালোকিত স্বপ্নের মাঝে তাহার সঙ্গে বেড়াইবার মত সহচরী যেন সত্যই জুটিয়াছে !

মীরার মুখের দিকে চাহিয়া শচীনবাবুর হাসি পায়। মীরা কি মনে করিয়াছে তাহা সেই জানে! যৌবনের স্তুতিগানই কামনা নয়— অতীতকে মোহময় করিয়া রাখামাত্র ।

শচীনবাবু খাইতে বসিয়া মাঝে মাঝে বিমনা হইয়া পড়িতেছিলেন, মীরা তাই পরিহাস করিয়া কহিল, দেখো মাছের কাঁটা খেয়ে ফেলো না ? মনটা উড়ু উড়ু করছে ত !

—ওখানে যারা এসেছিল তারা সব আজ একদম প্রেমে পড়ে গেছে, আর রক্ষা নাই ।

—বাঁচলুম, একটু ঘুমিয়ে বাঁচা যাবে। মীরার এই জবাবের কিছু তাৎপর্য্য আছে। শচীনবাবু যতক্ষণ লেখাপড়া করিতেন ততক্ষণ মীরাকে জাগিয়া থাকিতে হইত ; কিছুতেই ঘুমাইতে দিতেন না। মীরা আড়ি করিয়া ঘুমাইবার ভাণ করিত।

শচীনবাবু কহিলেন, যাক্ তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কার্য্যটা তা হ'লে এবার কিছু কিছু হবে। যারা সব প্রেমে পড়েছে তাদের নিয়ে কি করবো শুন্‌বে ?

—আর যাই কর, এখানে ডেকে এনে হট্টগোল ক'রো না, অন্ততঃ দুপুরে কি রাত্রে নয়।

শচীনবাবু হাসিলেন।

*

পরের শনিবার সন্ধ্যায় গার্লস্কুলের বেয়ারা আসিয়া একখানা পত্র দিয়া গেল—

প্রিয় শচীনবাবু,

জানি আপনি আটটায় ঘুম থেকে ওঠেন, বিশেষতঃ রবিবারে, কিন্তু রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী পালন ক'রতে হলে রবিবার সকালে আমার এখানে সাতটার সময় আসা দরকার। সত্যর মুখে শুনলাম আপনার নাকি আমাদের গেট-ভীতি আছে, যাহা হউক রবিবারে গেট উন্মুক্ত থাকবে। নির্ভয়ে আসবেন। নমস্কার ইতি—

বিনীতা—
শ্রীঅণিমা রায়

শচীনবাবু কয়েকবার চিঠিখানা পড়িলেন—তাঁহার আটটায় ঘুম হইতে উঠিবার সংবাদটা যেমন করিয়াই হউক হেড মিস্ট্রেস অবগত আছেন। গেট-ভীতিটা সত্যই তাঁহার আছে। গেটের সামনে অপেক্ষা করাটা

তাঁহার যেন বড় হীনতা ও অপমানকর বলিয়া মনে হয়। মিস্ রায় তাহার সম্বন্ধে এ সমস্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়াছেন এ একটু আনন্দেরই। শচীনবাবু মনে মনে খুশী হইয়াছিলেন।

রবিবারে সকালে উঠিবেন মনস্থ করিয়াই শচীনবাবু শুইয়াছিলেন, কিন্তু উঠিয়া দেখেন আটটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হইয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

মীরা বলিল, বেশ, দুধের ঘটি মাছের খালুই নিলে না।

—এসে বাজার করব। যাচ্ছি মিস্ রায়ের সঙ্গে দেখা করতে, আর ঘটি-খালুই নিয়ে কি করব ?

—তবে বাজার আজ হবে না !

—হবে, ফিরে এসে—

শচীনবাবু রওনা হইলেন। গেট-দরজা সত্যই খোলা ছিল, মিস্ রায় আপিস ঘরেই ছিলেন। শচীনবাবু তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, নমস্কার।

—নমস্কার। মিস্ রায় মণিবন্ধের ক্ষুদ্রতম ঘড়িটা দেখিয়া কহিলেন, সাড়ে আটটা বেজেছে। আপনার সময় জ্ঞানের প্রশংসা করি। এক ঘণ্টা বসে আছি হাঁ করে—

—অপরাধ ক্ষমাযোগ্য। তবে ওরকম কথাটা আপনার না বলাই ভাল।

প্রতীক্ষা করাটা ?

হ্যাঁ, যদিও সেটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক নয়।

—যাক, আসন পরিগ্রহ করুন। একটু চা খাবেন ত ? দাঁড়ান বলে আসি।

মিস্ রায় চলিয়া গেলেন এবং কিছুক্ষণ বাদে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনার ছেলেটিকে নিয়ে এলেন না কেন ?

—সে রকম আদেশ ছিল না।

—ও—আমার আদেশের অপেক্ষাই বসে থাকেন না কি? মিসেসের কাছে বল্‌তেই বোধ হয় সাহস হয়নি।

—কি?

—এখানে এসেছেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে?

—আজ্ঞে না, এত বড় দুঃসাহস আমার নেই। অনুগত স্বামী হিসাবে আমার কোন ত্রুটি নেই। পাড়ায় সকলে একথা ব'লে থাকেন।

—কেন?

—আমাদের মত আদর্শ স্বামীদের একটা ক্লাব আছে তার নাম সাওে ক্লাব, স্ত্রীকে সর্ব্বতোভাবে সুখী-করা অনুশীলন হয় সেখানে। যথা রমণীবাবু মাছ পর্য্যন্ত কুটে দেন, সুরেনবাবু উনুন ধরিয়ে দেন এবং আমি!—নিজমুখে আত্ম-প্রশংসা করা উচিত হবে না।

মিস্ রায় কিছুক্ষণ হাসিয়া বলিলেন, ওটাত গুড্ হাজব্যাণ্ডস্ এ্যাসোসিয়েশন নাম হওয়া উচিত।

—আমরা নিজেদের নাম বিজ্ঞাপিত করতে ইচ্ছে করি না তাই।

একটি হোষ্টেলের মেয়ে চা ও কিছু জলখাবার লইয়া আসিতেছিল; মিস্ রায় কহিলেন, এই ঘরটায় আমাদের সভা হবে ত?

—হ্যাঁ, এতে কুড়িখানা চেয়ার পড়বেই। তা ছাড়া ঐ ঘরের টেবিলটা জুড়ে দিলেই হবে।

—চা খেয়ে নিন, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। খাবার বাজারের নয় এখানেই তৈরী—

শচীনবাবু খাইতে খাইতে কহিলেন, যাক্ সমিতির সম্পাদকতা একেবারে আপখোরাকী নয় তা হলে।

মেয়েটি চলিয়া গেল।

—না একেবারে আপখোরাকী নয়। আপনি সেদিন সভার আধঘণ্টা আগে আসবেন কিন্তু, অন্ততঃ হলটা ঠিক হ'ল কিনা দেখ্‌বেন। আর আমাদের কার্য্যসূচী স্থির হ'য়েছে ?

—হ্যাঁ, আমার প্রবন্ধ, মিস্‌ সেনের গান, অনুকূলবাবুর গান, উমার সেতার, হরেনবাবুর আবৃত্তি, আপনার গান।

—আমার গান ?

—হ্যাঁ।

—আমি ত গান জানি না।

—জানেন শুন্‌লাম তাই ওটা শুন্‌তে হবেই আমাদের।

—না-না-না, আপনি ভুল শুনেছেন। সত্যিই গাইতে পারি না। ও রকম ভয় দেখালে আমি অসুস্থ বলে ঘরে দোর দেব।

—সেকি কথা। যাক্‌ আপনাকে অত কষ্ট করতে হবে না, পরে—

—যাক্‌ ওসব কথা। কি খাবার করা যায় বলুন ত।

—আমি অবশ্য আদর্শ স্বামী কিন্তু তাই বলে রাঁধতে পারিনা। কাজেই ওসম্বন্ধে আমার যুক্তি না হয় নাই নিলেন।

—সিরিয়স্‌লি বলুন, ঝাল না মিষ্টি কি তৈরী করবো ?

—দুই-ই করবেন। সঙ্গে একটু কষায় ও অম্ল থাক্‌লে আরো ভালো।

—পরের উপর দিয়ে বুঝি! দেখা যাবে আপনার বাসায় কি খাওয়ান।

—আমার বাসায় ? সে আশা এ জীবনে না করাই ভাল, একেবারেই নিরাশ হ'তে হবে।

—ও সমিতিটা চল্‌বে পরস্মৈপদী।

—যথা সম্ভব। সম্পাদক অন্ততঃ তার পদমর্য্যাদায় বাদ যাবেন।

—স্কুলের ঘড়িতে ৯॥০টা বাজিয়া গেল। শচীনবাবু বলিলেন, যথাসম্ভব উপদেশ বোধহয় দেওয়া হ'য়েছে, এখন উঠি।

—বসুন না, এত তাড়াতাড়ি কি ?

—বাজার করতে হবে যে !

—চাকরে করবে।

শচীনবাবু হাসিয়া বলিলেন, চাকর ? চাকর পাবো কোথায় ? আমিই চাকর, আমিই ঝি, আমিই বেয়ারা, আমিই খান্‌সামা।

মিস্ রায় একটু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, তা হোক্, একটু পরে বাজারে গেলেও চল্‌বে।

—তা চল্‌বে, তবে অহেতুক একটা গৃহবিবাদের সৃষ্টি হয়।

—হোক্, অত ভীতু হ'লে সংসার চলে না।

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, পুরুষের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার জন্যে আপনারা একবার বিবাহবিচ্ছেদ চাইছেন, আবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার হতে চাইছেন, আবার আপনারাই গৃহ-বিবাদ সমর্থন করছেন।

মিস্ রায় হাসিয়া বলিলেন, গৃহ থাক্‌লেই বিবাদ থাক্‌বে। ওর জন্যে এত ভাবনা কি ?

শচীনবাবু কহিলেন, এটা সত্যি কথা। গৃহ অর্থাৎ গৃহবিবাদ—

—আপনার কথায় সন্দেহ হয় বাড়ীতে আপনি ভালমানুষ মোটেই নন। যাক্ একদিন শুনে আস্‌বো গিয়ে আপনার কাহিনী। এর পরে যেদিন আস্‌বেন ছেলেটাকে নিয়ে আস্‌বেন কিন্তু—বড্ড দুষ্টু না ?

—দুষ্টু, দুরন্ত, বদমেজাজী, জেদী, অবাধ্য, কুৎসিত।

মিস্ রায় হাসিয়া ফেলিলেন। শচীনবাবু মৃদু হাসিয়া নমস্কারান্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

*

ফিরিবার পথে ভাবিলেন এই প্রসন্ন মেয়েটির রুক্ষভাষী, বদমেজাজী প্রভৃতি বদনাম রাষ্ট্র হইল কেমন করিয়া। তাহার সঙ্গে যেটুকু পরিচয়

তাহার কোথাও আড়ষ্টতা নেই, জড়তা নেই, সাবলীল স্বচ্ছন্দ গতি স্রোতস্বিনীর মত সুষ্ঠু সংযত—মানুষের দেখিবার শক্তি, বুঝিবার বুদ্ধি কি এতই কম! শিক্ষিত অনেক মহিলার সঙ্গেই তাহার পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এমন উদার মন ও স্বচ্ছন্দগতি মেয়ে সত্যই দুর্লভ—অকারণ স্পর্দ্ধা নাই অথচ আভিজাত্যবোধ আছে, অবান্তর কথায় সম্মোহন নাই—অথচ কথা বলিবার ভঙ্গীতে রুচিজ্ঞান ও তীক্ষ্ণতা আছে। অন্তরের স্বাধীনতা আছে, অন্তর রুদ্ধ কামনার বিকারে মূঢ় নয়।

শচীনবাবু মনে মনে তাঁহার প্রশংসাই করিলেন। সাধারণের মতটা যে কত ভুল তাহা দেখিয়া হাসিলেনও।

*

সভার পূর্ব্বদিন সকালে সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, সভার সমস্ত ব্যবস্থা করে এলাম। আপনি কেবল একটু আগে গিয়ে সব দেখে নেবেন।

শচীনবাবু কহিলেন, ব'স। এমনি হলে সম্পাদকতা করতে পারি।

সত্যকথা বলতে কি সত্য, মাঝে মাঝে মনে হয় তোমরা আমাকে বাঁদর নাচাচ্ছ এবং তোমাদের প্রতি দুর্ব্বলতা বশতঃ আমিও অকুণ্ঠচিত্তে নাচ্ছি।

সত্য চোখ মেলিয়া ধরিয়া কহিল, সে কি মাষ্টারমশায়?

—শহরের লোকে ত অখ্যাতি রটনা করতে পারে, তারা ত এটা ভাল চোখে নাও দেখতে পারে।

—সবই হতে পারে কিন্তু হয় নি। কতজন সমিতির সভ্য হবার জন্যে ব্যাকুল, আমাকে বলেছে, কিন্তু আমি আপনার জন্যে রাজী হইনি।

—আমার জন্যে?

—হ্যাঁ, আপনি বলেছেন যোগ্যতা থাকা চাই, তা ছাড়া কুড়ির বেশী

সভ্য-সংখ্যা হবে না। কিছুক্ষণ অবান্তর আলাপের পর সত্য বলিল, রবিবার বৈকালে ছেলেদের একটা সভায় সাহিত্য সম্বন্ধে আপনাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে।

—বক্তৃতা ?

—হ্যাঁ, শহরে আর কে বলবে বলুন। ছেলেরা শুনতে চায়।

—আমিই তা হলে শহরের একমাত্র বক্তা। কিন্তু সত্য, তোমার মুখ চেয়ে অনেক করেছি এসব ত আমার সাধ্যাতীত।

—যাই বলেন, আপনাকে যেতেই হবে।

শচীনবাবু সত্যর এই আব্দারে হাসিলেন, এমন জোব করিয়া অকৃত্রিম দাবি ত কেহ জানাইতে পারে নাই। শচীনবাবু সত্যর মুখের পানে চাহিয়া তাহাই ভাবিতেছিলেন। সত্য তাহাকে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করে।

সত্য আবেদনের সুরে কহিল, আমাদের মুখ চেয়ে অনেক করেছেন এবং আরও অনেক করতে হবে। বিপদে-আপদে আপনারা বুদ্ধি দেবেন, আদেশ দেবেন তবেই ত আমরা চলতে পারব—আপনাব শিক্ষা ও চালনা ব্যতীত আমরা নিরুপায়।

—বিপদ-আপদ ত হচ্ছে না।

সত্য হাসিয়া কহিল, বিপদ হতে কতক্ষণ।

—সাহিত্যের বক্তৃতায় তার আর কি হবে ?

—হবে। আমরা যা জানতে চাই তা জানতে দেবেন না ? শহরের খবর জানেন ? আজ দশ জন গ্রেপ্তার হয়েছে। কংগ্রেসের কাজে বা বিপ্লবাত্মক কাজে যাদের পূর্ব্বে জেল হয়েছে একে একে তাদের সকলকেই বন্দী করা হ'ল। এই নিরপরাধ লোকেদের কেন ধরেছে ? সত্যি বড় কষ্ট হয়—ভাঁটুদা দশ বছর জেল খেটে এসে দোকান করে খাচ্ছিল, তাকে নিয়ে গেল। তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে তাকিয়ে রইল, তারা কি করে দিন

কাটাবে। দোকান দেখবার কে আছে? আর ভাঁটুদা ত কোন কাজেই ছিলেন না, পাকা সংসারী তবুও তাকে ছাড়লে না—কিন্তু ভাঁটুদা হাসছে, যাবার সময় কি বললে জানেন?

—কি?

—ভগবান আছেন, তিনিই দেখবেন, আমি নিমিত্ত মাত্র। তোমাদের ভয় নেই। তাঁর স্ত্রী চোখে আঁচল দিলেন। ভাঁটুদা আবার হেসে বললেন, কোন ভয় নেই, ভগবান রক্ষা করবেন। নিজেই পুলিশকে বললেন, চলুন আর দেরী নয়।

শচীনবাবু একটু উন্মনা হইয়া গিয়াছিলেন। সত্যই এঁরা দেশের জন্য জীবনকে তুচ্ছ করিয়াছেন, কিন্তু বিনিময়ে পাইয়াছেন লাঞ্ছনা। এই অসহায় পরিবারটি কেমন করিয়া উদরান্নের সংস্থান করিবে?

অকস্মাৎ তাকাইয়া দেখেন সত্য তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে। স্মিতহাস্যে বলিল, দুঃখ পেলেন স্যার? শুধু কি ভাঁটুদা—সমগ্র ভারতে এমনি কত সহস্র ভাঁটুদা যে সানন্দে জেলে যাচ্ছে তার লেখাজোখা নেই। সকলেই নিঃস্ব—ভগবানের করুণার উপরেই ছেড়ে দিয়েছে স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে। তাদের বাঁচিয়ে রাখা কি আমাদের ধর্ম্ম নয়।

অবশ্যই! কিন্তু আজ আমরা যে নিজেরাই বাঁচতে অক্ষম।

সত্য হাসিয়া কহিল, সেও ত সত্যি।

সত্য চলিয়া গেল। শচীনবাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, সত্য কি বলিতে চায়? সে কি বলিতে আসিয়া কি বলিয়া গেল? কি যেন একটা কথা সে বলিতে চায়, কিন্তু বলিতে পারে না, নানা কথার ছলে কথাটাকে চাপা দিতে চায়। শচীনবাবু বুঝিতে পারেন না, সত্য ভাঁটুদার কথা বলিতে বলিতে এমন করিয়া হাসিল কেন? তাহার বিদায়-মুহূর্ত্তটি ত হাস্যকর নয়, শুনিলে কান্না পায়।

*

অদ্য রবীন্দ্র মৃত্যুবার্ষিকী।

শচীনবাবু সমিতির খাতাপত্র সহ যখন বালিকাবিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলেন তখনও সভা আরম্ভের কিছু বিলম্ব ছিল। মিস্ রায় অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন, আসুন শচীনবাবু, এত দেরী করতে হয়। দেখুন ত হলটা ঠিক সাজানো হ'য়েছে কিনা।

শচীনবাবু সজ্জিত হলটার উপরে দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া কহিলেন, কত বড়লোকের বাড়ীতে এমনটি হয় না। এত ফুল, এত টেবলক্লথ আপনি পেলেন কোথায়?

মিস্ রায় হাসিয়া কহিলেন, কেউ যদি নিন্দে করে তবে ব'লবো আপনি সাজিয়েছেন আর ভাল ব'ল্‌লে আমি! কেমন?

—হ্যাঁ, আমি বৃদ্ধ, নিন্দাস্তুতি আমার সমান।

—বৃদ্ধ বৃদ্ধ বল্‌বেন না। বড্ড রাগ হয়। মিথ্যা বয়সের দোহাই দিয়ে যে সম্মান আদায় ক'রবেন সেটি হবে না।

—বয়সকে সম্মান না ক'রলেই পারেন।

—তবে।

—সমবয়সীকে ক'রবেন।

মিস্ রায় কথার ইঙ্গিতটা লক্ষ্য করিয়া হাসিলেন। বলিলেন, সেটা আর এ জীবনে হ'ল বলে মনে হয় না।

—নিরাশ হওয়াটা দুর্ব্বলতার লক্ষণ। নেপোলিয়ন ব'লেছেন—

—থাক্, আমি নেপোলিয়ন নই, ক্ষুদ্র স্ত্রীলোক মাত্র।

—মহিলা মাত্র।

অদূরে কয়েকজন সভ্যকে দেখা গেল। শচীনবাবু অভ্যর্থনা করিলেন, আসুন আসুন, মিস্ রায়ের প্রতিনিধিরূপে আমি অভ্যর্থনা ক'রছি।

মিঃ সেন ব্যঙ্গ করিলেন, প্রতিনিধিত্বটা কি আত্ম-নিযুক্ত ?

—না, অকৃত্রিম।

—আমি সন্দেহ করি।

—ওটা আপনার রীতিক। হাকিমী ক'রলে ও দোষটা হয়—বিশেষতঃ কড়া হাকিমদের ও বদনামটা আছে।

—ও দুর্নামটা কি খাঁটি ?

–হ্যাঁ, সর্ব্বজনবিদিত।

—হেতু ?

—সম্ভবতঃ গৃহের কঠোর শাসনের প্রতিচ্ছবি।

মিষ্টার সেন হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, হ্যা, সত্যিই। সিগারেট কণ্ট্রোল, চা কণ্টোল—কি পরাধীন। দেশে, গৃহে, সভাস্থলে সর্ব্বত্র—

একে একে সকলেই সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সভাপতি বরদাবাবু লাঠিখানা সভাগৃহের কোণে রক্ষা করিয়াই কহিলেন, তবে সভার কার্য্য আরম্ভ হোক।

সকলে হাসিয়া তাঁহার বলিবার ভঙ্গিটীর তারিফ করিলেন। রমণীবাবু কহিলেন, বরদাবাবুর সভাপতিত্ব কেউ অস্বীকার ক'রবে না, এত চট্‌পট্ সভা আরম্ভ কর, যাতে ক'রে—

মিঃ সেন কহিলেন, আজ্ঞে, যাতে ক'রে তাড়াতাড়ি শেষ হয়।

সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। জনৈক মহিলার রবীন্দ্র সঙ্গীতের পরে মিস্ রায় 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নারীরূপ' পাঠ করিলেন। শচীনবাবু 'রবীন্দ্র সাহিত্যে হাস্যরস' প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

ধীরে ধীরে সভায় বিতর্ক আরম্ভ হইল। স্কুল ইন্সপেক্টর হরেনবাবু বিতর্ক আরম্ভ করিলেন শচীনবাবুর প্রবন্ধ লইয়া।

সত্যদাস জবাব দিল, শচীনবাবু জবাব দিলেন। বিতর্ক জমিয়া উঠিয়া

যখন মন্দীভূত হইল তখন মিস্ রায় বলিলেন, সম্পাদক মহাশয়, আলাপ আলোচনা—

শচীনবাবু চট্ করিয়া বলিলেন, আজ্ঞে শেষ।

—তবে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সকলেই হাসিয়া উঠিলেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ'র অর্থ যে সুদূরপ্রসারী এবং রসনা তৃপ্তিকর তাহা সকলেই বুঝিলেন। মিস্ রায়ের ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন সুসজ্জিতা সুন্দরী ছাত্রী মুহূর্ত্তে টেবিল প্লেট প্লাবিত করিয়া ফেলিল। মিষ্টি, নোন্তা এবং পানীয়ের পাত্রে টেবিলটা ভরিয়া উঠিল।

মিস্ রায় শচীনবাবুকে ব্যঙ্গ করিলেন, আপনাকে আর এক কাপ চা দেবে কি?

—এখনি? যাবার সময় দিলে ভাল হ'ত না।

মন্দীভূত বিতর্ক থামিয়া গেল। সকলেই খাদ্যের গুণকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। বরদাবাবু সংসারী লোক, তিনি সহানুভূতির সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন, যারা পরিবেশন ক'রলে তাদের জন্যে আছে ত?

শচীনবাবু জবাব দিলেন, লেখাপড়া শিখে তারা এত বোকা হ'যেছে বলে মনে হয় না।

সভাস্থ সকলেই হাসিলেন, বাহিরে ছাত্রীকুলের হাসির শব্দ ভাসিয়া আসিতে লাগিল। চারিপাশের এই স্বচ্ছন্দ আনন্দের মধ্যে ক্ষুদ্র সমিতি প্রাণময় হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সকলের মনে হইল—এ সভা স্মরণীয়।

হরেনবাবু কহিলেন, আমি অনতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা ক'রতে চাই।

—করুন করুন। সকলে সমস্বরে উৎসাহ দিলেন।

—আজকার গুরুভোজনের ব্যবস্থা যিনি নিজ ব্যয়ে করেছেন তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। যিনি এর কারণ, অর্থাৎ সম্পাদক মহাশয়কেও

ধন্যবাদ জানাই। আশা করি, এমনি অধিবেশন মাসে অন্ততঃ দু'চার দশটা বিশটা হবেই।

শচীনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কিন্তু আমি মিস্ রায়কে নিন্দা করি, কারণ তিনি যে পথপ্রদর্শন ক'রছেন তা কণ্টকিত এবং বহু ব্যয়-সাপেক্ষ। অন্যান্য সভ্য হয়ত এ পথে পদার্পণ ক'রতে ভীত হবেন, কারণ এর তুলনায় আয়োজন করা সম্ভব না হ'তে পারে কিন্তু সভ্যগণের প্রতিনিধিরূপে আমি নিঃসংশয়ে জানাতে চাই যে, যে-কোনরূপ আতিথেয়তাই আমরা সানন্দে গ্রহণ ক'রবো এবং প্রশংসা ক'রবো। এটুকু উদারতা আপনাদের মাঝে আছে। হরেনবাবুকে আমি ধন্যবাদ দেই যে তিনি আজকার আহ্বানকারিণীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং তদ্দ্বারা তিনি যে নিশ্চয়ই পরবর্ত্তী অধিবেশন তাঁর গৃহে আহ্বান ক'রে আমাদের ধন্যবাদার্হ হ'য়েছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই—তাঁর ধন্যবাদ দানের এ অর্থ নিশ্চয়ই আপনাদের নিকট সুপরিষ্কার হ'য়েছে।

বরদাবাবু কহিলেন, বলা বাহুল্য মাত্র।

হরেনবাবু অসহায় ভাবে কহিলেন, আমি ?

মিষ্টার সেন কহিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ! সামান্য কথাটা আর বুঝছেন না।

শচীনবাবু কহিলেন, আজ্ঞে তা হ'লে তার পরবর্ত্তী অধিবেশনের সামান্য কথাটা—মিঃ সেনের নিবেদনটা—সভ্যগণের নিকট নিশ্চয়ই পরিষ্কার।

মিঃ সেন কহিলেন, এখনও একটু অপরিষ্কার রইল। ভবিষ্যতে পরিষ্কার হবে।

—আশা করি অনতিবিলম্বে।

বরদাবাবু কহিলেন, বলা বাহুল্য মাত্র।

সভা ভঙ্গ হইল।

*

সকালবেলা শচীনবাবু একটা সিগারেটের ধূমপান করিতে করিতে গত রাত্রির উৎসবের আনন্দটাকে স্বপ্নলোকে নূতন করিয়া ভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। একটা কথা বার বার তাঁহার কানে প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। কথা প্রসঙ্গে মিস্ রায় বলিয়াছিলেন, বসে বসে করেন কি ? মাঝে মাঝে এলেও ত পারেন, গল্প করা যায়। একাকী বন্দীজীবন যাপন করি।

অকারণ অনির্দ্দিষ্ট একটা আকর্ষণ বার বার তাহার মনটাকে শ্রীমতী অণিমার দিকে দুর্ব্বার বেগে টানিতেছিল এবং তিনি মনে মনে যাইবাব একটা অজুহাত খুঁজিতেছিলেন কিন্তু বার বারই মনে হইতেছিল—লাভ নাই। হয়ত তাঁহার দুর্ব্বলতা আছে, হয়ত নেই তবুও—

মীরা চা লইয়া আসিয়া টিপ্পনী করিল, কার ধ্যান করছো গো ?

—সুন্দরী বিদুষীদের ধ্যান করছি।

মীরা স্মিতহাস্যে কহিল, ধ্যান করো, উনুনে তেল রয়েছে—মীরা চলিয়া গেল। শচীনবাবু যেন একটু স্বস্তি বোধ করিলেন, সত্য কথা বলিয়া এমনি একটা পরিতৃপ্তি পাওয়া যায়। মীরা হয়ত মনে করিয়াছে তাঁহাকে উত্ত্যক্ত করিবার জন্যই একথা বলা হইয়াছে।

শচীনবাবু আবার আনুপূর্ব্বিক ভাবিয়া সভার রসাস্বাদন করিতেছিলেন। সত্য আসিয়া নমস্কার করিল।

শচীনবাবু কহিলেন, বসো। কালকার সভাটা বেশ জমেছিল, না ?

—হ্যাঁ, স্যার খুব জমেছিল। খবরের কাগজ পড়েছেন স্যার ?

—নিশ্চয়ই।

—কি মনে হয় ?

—নেতৃবৃন্দ জেলে যাবেন, দেশে একটা বিক্ষোভ হবে অনেকে জেলে

যাবে। অনেকে বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দেবে, তার পর আবার যেমনটি ছিল তেমনিই হবে।

—না স্যার। এবার স্বাধীনতা আসবে, এখন ক্ষমতা হস্তান্তর ছাড়া ওদের গত্যন্তর নেই।

শচীনবাবু কহিলেন, যক্ষ্মারোগীও স্যানাটোরিয়ামে যায়—অথচ জানে যে সে বাঁচবে না। তাই ক্ষমতা যতক্ষণ রাখা যায় ততক্ষণ সঙ্গীন দিয়েই হোক, ব্রেণ গান দিয়েই হোক তা তারা রাখবেই।

—কিন্তু আমাদের কি কোন কর্ত্তব্যই নেই।

—কিছু না। যে দেশের লোক ভাইকে ধরিয়ে দিয়ে চাকুরীর উন্নতি করে, দশটা টাকা দিলে গোপন তথ্য প্রকাশ করে, পঁচিশ টাকায় মত বদলাতে পারে সে দেশে কোনও কর্ত্তব্য নেই। রোজগার কর, খাও।

—সকলেরই।

—হ্যাঁ স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে।

—কিন্তু ভারত এবার ওদের ছাড়তেই হবে যে।

—প্রাণ থাকতে ছাড়বে না। হাত পা সবল থাকতে কেউ বুকে ছুরি মারতে দেয় ?

সত্য হাসিয়া বলিল, আমাদেরও কি কিছুই করণীয় নেই ?

—কি করবে। দুঃখ-লাঞ্ছনা সহ্য করতে পার তবে তা সবই নিষ্ফল হবে। দেশ তৈরি না হলে বিপ্লব হয় না। দেশ তৈরী করে তবে বিপ্লব করতে হয়। এ দেশ জড়ের দেশ, মূঢ়ের দেশ তা জানো না ?

সত্য হাসিল। কিছুক্ষণ পরে কহিল, আপনি বড় নিরাশাবাদী। ভাল কথা, আপনি কি দিদিমণির ওখানে যাবেন ?

—যেতে পারি।

—তবে এই টাকা দু'টো তাঁকে দেবেন। ধার নিয়েছিলাম, আর

বলবেন, তাঁর টাকা যখন দরকার হবে তখন চেয়ে পাঠাব, এখন টাকা দু'টো তাঁকে নিতেই হবে।

শচীনবাবু কহিলেন, বলব।

—আসি স্যার, নমস্কার। জরুরী কাজ আছে, রবিবারে বক্তৃতাটা দিতেই হবে—বাইরের অনেক স্কুল ও কলেজের ছাত্র আসবে।

সত্য চলিয়া গেলে শচীনবাবুর সহসা মনে হইল সে দুইটি টাকা সম্বন্ধে যাহা বলিয়া গেল তাহা যেন রহস্যপূর্ণ। কিন্তু কি রহস্য থাকিতে পারে তাহা ভাবিয়া পাইলেন না, তবে মনে মনে শ্রীমতী রায়ের ওখানে যাইবার মত একটা অজুহাত পাইয়াছেন দেখিয়া খুশীই হইলেন। বৈকালে যে অবশ্যই যাওয়া দরকার তাহা মনে মনে স্থির করিয়া ফেলিলেন।

*

দুইটি মহিলা অকুণ্ঠ পদক্ষেপে তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিল। শচীনবাবু একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনারা ?

এক জন হাসিয়া কহিল, আপনারা নয় তোমরা। আমরা আপনার ছাত্রীই। আমার নাম গীতা আর ওর নাম অঞ্জলি। আমরা এবার বি-এ পরীক্ষা দিয়েছিলাম। আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম।

—আমার নাম ?

—হ্যাঁ, আপনার কথা শুনে। শুনেছি, আপনার লেখা পড়েছি। বৌদি কোথায় ?

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই গীতা অন্দরে প্রবেশ করিল। অঞ্জলি কহিল, সত্যদার মুখে আপনার এত প্রশংসা শুনেছি যে না এসে আর থাকা গেল না।

শচীনবাবু কহিলেন, সত্য মিথ্যাবাদীও বটে। আমারও প্রশংসা করে —সেটা নিশ্চয়ই মিথ্যাভাষণ।

—না মাষ্টারমশায়। সত্যদা মিথ্যা বলে না—আমরা সাহিত্য সমিতির সভ্যও হতে চাই, অবশ্য যদি যোগ্যতা থাকে।

—যোগ্যতার অভাব কি আপনাদের। আপনাদের মত সভ্য পাওয়া—

—'আপনি' বলছেন কেন ?

—হ্যাঁ, তোমরা আসবে সে ত ভাল কথা।

কিছুক্ষণ কথা বলিতে বলিতে গীতা ও মীরা তিন কাপ চা লইয়া ফিরিল।

গীতা বলিল, আমিই চা করে আনলুম। বৌদি ত ইস্কুলের ভাত রাঁধতেই ব্যস্ত।

মীরা চলিয়া যাইতেছিল, গীতা কহিল, দাঁড়ান বৌদি। আপনাকে সাহিত্য সমিতির সভ্য হতে হবে।

মীরা কহিল, সে কি, আমি যে ও ছাই পাশ কিছু বুঝি না।

—বুঝবার দরকার কি ? এমনিই বসে বসে শুনবেন।

—না না, সে হয় না। আমি সভাসমিতিতে যেতে পারব না—রাঁধবে কে ? উনুনে মাছ রয়েছে, আসি—

মীরা চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ অত্যন্ত প্রগল্‌ভ ও অবান্তর আলাপের পর গীতা এবং অঞ্জলি চলিয়া গেল।

শচীনবাবু বিস্মিত হইলেন মেয়ে দুইটির অকুণ্ঠ ব্যবহার দেখিয়া। ইহাদের পিছনে সত্যর অবস্থিতি অনুমান করিয়া একটু যেন অস্বস্তি বোধ করিলেন। সত্যর কর্ম্মপদ্ধতি ও প্রচার বাস্তবিকই রহস্যময় মনে হইতে লাগিল—সত্য কি বিপ্লবী ?

যতদূর মনে পড়ে—সত্য অত্যন্ত নম্র স্বভাব, ছাত্র হিসাবেও খুব তীক্ষ্ণধী নয় এবং অত্যন্ত সরল ও নিরুপদ্রব। যাহারা অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না নির্ব্বিবাদে সহ্য করে তাহাদের মতই নিরীহ। সে কি বিপ্লবী

হইতে পারে! সে ত কোনদিন কখনও সভাসমিতি কি আন্দোলনে যোগ দেয় নাই—নিষ্কলুষ নিরীহ ছাত্র মাত্র। সে সাহিত্য ভালবাসে, সাহিত্যিক হইতে চায়, সম্ভবতঃ সেই জন্যেই সমিতিকে পুষ্ট করিতে উৎসুক। তবুও সন্দেহ হয়—

মীরা আসিয়া প্রশ্ন করিল, এসব কি হ'চ্ছে? মেয়েরা সব তোমার কাছে আসে কেন? বি, এ, পাশ মেয়েরা—

—ওরা সব আমাকে বিয়ে করবে বলে ক্ষেপেছে।

—না সত্যি করে বল।

—সম্ভবতঃ যৌবনটা ফিরে এসেছে।

মীরা পরিহাস ত্যাগ করিয়া আন্তরিকভাবে প্রশ্ন করিল, সত্যি করে বলো। এত দিন ত ওরা আসেনি, আমাব কিন্তু ভাল লাগ্‌ছে না—

—আমারও না, তবে আস্‌ছে আসুক, আমি কিন্তু একটু খুশীই হ'চ্ছি।

—সে ত জানিই, কিন্তু কেন সত্যি বল না।

শচীনবাবু বলিলেন, আমি কি করে জান্‌বো, ওদের জিজ্ঞাসা করলেই পারতে।

মীরা আর কোন প্রশ্ন করিল না তবে ভারাক্রান্ত মনেই চলিয়া গেল। কোন অমঙ্গল আশঙ্কায় সে যেন ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

*

বৈকালের দিকে একটা অদম্য আকর্ষণ ও সত্যদাসের দুইটি টাকার অজুহাত শচীনবাবুকে মিস্ রায়ের দিকে টানিতেছিল। কিন্তু কেন এই আকর্ষণ, কেন এই প্রলোভন তাহা বিচার করিবার সময় তাহার হয় নাই, মিস্ রায়ের সান্নিধ্য তাহার ভাল লাগে এবং সেই জন্যেই তিনি প্রলুব্ধ।

দরজা উন্মুক্তই ছিল। শচীনবাবু জনৈকা ছাত্রীকে দিয়া খবর দিলেন।

মিস্ রায় অবিলম্বে উপস্থিত হইলেন। আসিলে বসাইয়া কহিলেন, হঠাৎ এখন এলেন যে!

—মাঝে মাঝে আস্তে আপনিই ত নিমন্ত্রণ করেছেন আবার বলেন হঠাৎ।

—ভুল হ'য়েছে, তবে আপনি যে এত সুলভ এটা ধারণা করিনি।

—দুর্লভ তাই বা বুঝলেন কি ক'রে?

—অনুমান। আপনি যেন ঝগড়া করতে এসেছেন বলে মনে হয়।

—আমি ত বলেছি, আমি অত্যন্ত নিরীহ লোক। ঝগড়া করবার ধৃষ্টতা আমার নেই। মিস্ রায় একটু ব্রীড়া ভঙ্গি করিয়া কহিলেন, যাক্, আপনার সঙ্গে কথায় জিতবো এমন দুরাশা নেই। একটু চা খাবেন ত, বলে আসি।

—যে আসে তার সকলকেই কি চা খাওয়ান।

—না, এটা আপনাব জন্যেই। মিস্ রায় উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেলেন।

শচীনবাবু একাকী বসিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এই মেয়েটি সম্বন্ধে এমন অদ্ভুত রটনা হইল কেমন করিয়া! কিন্তু একথাও সত্য বহু-লোক দেখা করিতে আসিয়া ফিরিয়া যায়, এবং কয়েকজনকে অত্যন্ত কঠিন-ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন।

মিস্ রায় ফিরিয়া আসিলে শচীনবাবু দুইটি টাকা বাহির করিয়া কহিলেন, সত্য আপনাকে দিয়েছে—

মিস্ রায় আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, টাকা ত ফেরৎ দেবার কথা ছিল না।

—সে বলেছে, টাকার যখন প্রয়োজন হবে তখন চেয়ে পাঠাবে, এটা গ্রহণ করুন।

—ভাল কথা, সেই হবে।

—আপনি তা হ'লে দান করে থাকেন ?

—পাত্র হিসাবে কিছু দিতে পারি।

—আমি কি অ-পাত্র ? অত টাকা মাইনে পান, কতই খরচ হয় ; আমাদের দিয়ে দিলেই পারেন। জর্জেট শাড়ী কিনতে পারি, গয়না তৈরী করতে পারি।

—সেটা ত আপনাকে দান হ'ল না। আপনি দানের জিনিষ দান করবেন খুব ত! সত্যিই আমার ইচ্ছে আছে যা টাকা সংগ্রহ করতে পারি তা কোন সৎকর্ম্মে দান ক'রবো বাকীটা ব্যয় করবো দেশ ভ্রমণে বিয়ে করা যখন হ'লই না।

—হ'ল না, নয় ক'রলেন না।

—তার মানে ?

—আই, সি, এস-এর স্বপ্ন দেখ্‌তে দেখ্‌তে হঠাৎ দেখলেন যেন বিয়ের বয়স পার হ'য়ে গেছে এই না ?

মিস্ রায় হাসিয়া বলিলেন, মোটেই না। স্বপ্ন কারও দেখিনি, মোটর বাড়ী, কিছুরই না—বিয়ে করতে পারি এমন একটা লোকের সঙ্গেই জীবনে আলাপ হ'ল না।

—বড়ই পরিতাপের কথা। পৃথিবীর ৬০ কোটি পুরুষের মাঝে—

—সকলের সঙ্গেই পরিচয় হ'য়েছে নাকি ? আপনি ত আচ্ছা লোক। মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করতে পাবি এমন লোক ত দেখলাম না।

—হায় অন্ধ, আগে বিবাহ ক'রতে হয় জুয়া খেলার মত পরে শ্রদ্ধাটা আপনিই গজিয়ে ওঠে—যেমন পচা কাঠে ব্যাঙেব ছাতা গজায়।

—যাক্ গে, আপনি বিবাহিত আপনার সঙ্গে এ সব তর্ক চল্‌বে না।

শচীনবাবু কহিলেন, তবে কি নিয়ে আলোচনা চলবে ? আচ্ছা আপনি কোন সৎকর্ম্মে অর্থ দান করতে চান—

—যে কোন রকম সৎ প্রতিষ্ঠান।

—সাহিত্য সমিতিটা কি যে সৎ-প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে আপনার সন্দেহ আছে!

—সৎ-প্রতিষ্ঠান? দুর্জ্জন-সমিতি, যারা নিরপরাধা মহিলাকে পেয়ে কথার প্যাঁচে পরাজিত করে নিমন্ত্রণ আদায় করে তারা সৎলোক? তাছাড়াও যারা পরের টাকায় জিনিষ না খেয়ে নষ্ট করে তারা ততোধিক দুর্জ্জন।

—যিনি অকারণ আড়ম্বরের মোহে অধিক খরচ করেন তিনি?

—সৎ লোক।

—জানেন আপনার এই আড়ম্বর দেখে অনেকেই সমিতির সভা আহ্বান করতে ভয় পাচ্ছেন এবং নারাজ হ'চ্ছেন।

—যারা ভয় পায় তারা ভীতু, আমার কি ব'লবার আছে।

—যারা বিয়ে করতে ভয় পায় তারা?

—তারাও ভীতু।

উভয়েই হাসিয়া উঠিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছিল—শচীনবাবু বলিলেন, আসি।

—বসুন না।

—সন্ধ্যা হ'য়ে এল, লক্ষ্মীপূজো আছে।

—লক্ষ্মীপূজো!

—আপনারা যাকে টিউসন বলেন।

—ওঃ, তবে আবার কবে আসছেন?

—আসবো, যেদিন সুযোগ হয়।

—রবিবার আস্‌বেন, সকালের দিকে। চা খাবেন, আর কিছু পাবেন না।

—রবিবারে যে বাজার করা আছে—সেটার কি?

—অন্য কাউকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করলে সে এটাকে ভাগ্য বলে মনে করতো, তা জানেন।

—জানি। আমিও দুর্ভাগ্য বলে মনে করছি না।

—হ্যাঁ, সৌভাগ্য বলে মনে করে, সুবোধ বালকের মত চলে আসবেন। নমস্কার—

নমস্কার।

*

শচীনবাবু যখন বাহির হইয়া আসিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মিস্ রায়ের কথাই ভাবিতেছিলেন, বাস্তবিকই তিনি দুর্ব্বোধ্য। অধুনা যে কয়টি মেয়ের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হইল সবই যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। স্ত্রীসুলভ লজ্জা, ভয়, নমনীয়তা নাই, এত স্পষ্টবাদী, এমন নির্ভয, যে মুহূর্ত্তে পরকে আপনার করিয়া লয়। মনে হয় যেন জন্মজন্মান্তরের পরিচয়—গীতা ও অঞ্জলি আসিয়া কেমন মুহূর্ত্তে তাহাকে আপনার করিয়া লইল।

রাস্তার পাশে একটা দোকানে ভিড় জমিয়াছিল। শচীনবাবু শুনিলেন, উচ্চকণ্ঠে এক জন সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, অন্য সকলে শুনিতেছে। সংবাদ গুরুতর, ভারতের নেতৃবৃন্দ একসঙ্গে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কংগ্রেস-পরিকল্পিত বিপ্লব সুরু হইবার পূর্ব্বেই তাহা দমনের জন্য এই প্রয়াস। শচীনবাবু ব্যথিত হইলেন, কেন তাহা বলা যায় না। নেতৃবৃন্দ ত জীবনের অর্দ্ধেকই কারাগারে কাটাইয়াছেন, কোন দিনও সেজন্য তিনি বেদনাবোধ করেন নাই। আজ কেন যেন রহিয়া রহিয়া অন্তরটা কাঁপিয়া উঠিতেছে—কোন্ অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিতে।

পরদিন সকালবেলা শচীনবাবু বিষণ্ণ মনেই বসিয়াছিলেন, সংবাদপত্রটি বার বার পড়িয়া ক্রমেই অধিকতর বিষণ্ণ হইতেছিলেন। যারা দেশপ্রেমের অপরাধে এদের বন্দী করিয়াছে তাহারাই ত দেশপ্রেমের জন্য ভিক্টোরিয়া ক্রস দেয়, তাহারা কি এই ত্যাগের মূল্য জানে না। এই নির্ভীক বীরত্বের কোন পুরস্কার দিবে না।

সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন স্যার।

—সে ত, সব সময়ই করছি।

—হ্যাঁ, আশীর্ব্বাদ করুন, যদি বেঁচে থাকি, স্বাধীন ভারতে আবার দেখা হবে। শচীনবাবু অবাক বিস্ময়ে সত্যর মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, তাহার মুখে দৃঢ় সংকল্পের দীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে, অন্তরের তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। সরল সুন্দর নিরীহ মুখচ্ছবির মাঝে আজ এ দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের ছবি কেমন করিয়া ভাসিয়া উঠিল।

সত্য হাসিয়া কহিল, আপনার আশীর্ব্বাদে আমরা জয়ী হব।

শচীনবাবু কথা বলিতে পারিলেন না। বার বার সত্যকে দেখিতে লাগিলেন—নিরীহ এই ছেলেটির অন্তরে এমনি দুর্জ্জয় সাহস কোথায় লুকাইয়া ছিল।

সত্য বলিল, আপনি কিছু বলছেন না?

—কি বলব তাই ভাবছি। তুমি তোমার বাবার কাছে শুনেছ?

—শুনেছি। তিনি বললেন, তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, এখন তোমরা যদি এই পথ বেছে নাও তবে আমার কি বলবার আছে! আপনার আশীর্ব্বাদ চাই আমরা—

শচীনবাবু বিষণ্ণ অন্তরে কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি, তোমরা জয়ী হও, কিন্তু তবুও কেন যেন মনে হয় সবই নিষ্ফল। নেতৃবৃন্দ কি চেয়েছিলেন তা তোমরা জান না, বিপ্লব কোন্ পথে চলবে তা জান না তোমরা কি কববে?

সত্য কহিল, তাঁরা বন্দী, তাঁদের কণ্ঠরুদ্ধ, কিন্তু আমাদের ত একটা কিছু করতে হবে। নেতৃবৃন্দ বন্দী হলেন সমগ্র দেশ নির্ব্বাক ভাবে দেখলে, এতে কি গৌরব বৃদ্ধি হবে আমাদের? যা হয় কিছু করতে হবে।

—তুমি করবে?

—কারা করবে? শহরের ত সকলেই জেলে, কে করবে বলুন?

আমার জ্ঞানবুদ্ধি মত যা পারি করব, কিন্তু যদি আপনাদের আশীর্ব্বাদ ও বুদ্ধি পেতাম, হয়ত কিছু কাজ হতে পারত। আপনি জানেন স্যার, শহরের সকলেই আপনাকে শ্রদ্ধা করে, আপনার ইঙ্গিত পেলে অনেকেই আজ কাজ করতে পারত—

শচীনবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আমার ইঙ্গিত? আজ দলবিশেষের দ্বারা তোমরা বেষ্টিত, ঘরে বাইরে এই সংগ্রাম তোমরা ক'দিন চালাবে? সব দুঃখকষ্ট নিষ্ফল হয়ে যাবে যে।

—যায় যাক্, তবুও জাতির জীবনের এই সন্ধিক্ষণে কিরূপে ঘরে বসে থাকতে পারি? আপনি রইলেন, আশীর্ব্বাদ করবেন। ভগবানের নাম স্মরণ করে আজ চলেছি, দুঃখ কষ্ট আমাদের যেন ব্যর্থ না হয়।

—আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের জয় হোক। তবে আমরা গতবিক্রম, নখদন্তহীন, আমরা দেখব ঘরে বসে আর দীর্ঘশ্বাস ফেলব।

—আর সময় নেই, আসি স্যার। সত্য শচীনবাবুর পদধূলি লইয়া চলিয়া গেল।

শচীনবাবুর মনটা বিষণ্ণ ছিল, সত্যর প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে আরও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। সত্যদাসকে সহসা যেন বড় আপনার মনে হইল—তরুণ জীবনের সমস্ত স্বপ্নকে পিছনে ফেলিয়া আজ ও চলিয়াছে অপরিসীম লাঞ্ছনাকে বরণ করিতে। মনে মনে তিনি তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল সত্য কি এই কথাটাই জানাইবার জন্য এত দিন এমনি ভাবে নানা কথায় তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছে। সত্য ত চলিয়াছে—কোথায় কে জানে? হয়ত ফিরিবে, নয়ত ফিরিবে না।

আজ তাঁহার মনে পড়ে অতীতের একটি কাহিনী—বহু দিন আগে '৩০ সালের কথা। গ্রামের যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত কর্ম্মী পাঠকদা'র বিদায়-দৃশ্যটি চোখের উপরে যেন ভাসিতেছে। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনের শেষভাগ—দলে দলে স্বেচ্ছাসেবক গ্রেপ্তার হইয়াছে, নিপীড়ন

ও রাজরোষে কত লোক কত পরিবার নিঃসম্বল হইয়াছে। পাঠকদা' এক দিন ম্লান হাসিয়া কহিলেন, আর ত বাইরে থাকা চলে না। যারা ছিল সব চলে গেছে, আর ত কর্ম্মী মেলে না, এখন আমার পালা। কাল সকালেই যাব। 'কোথায়'—এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন, শহরে, সেখানে গিয়ে গ্রেপ্তার হতে হবে। আমার কর্ত্তব্য আমি করেছি এই সান্ত্বনা ত আমার থাকবে। এর চেয়ে বেশী পুরস্কার আর কি আশা করা যায়। স্বাধীন ভারতে যদি বেঁচে থাকি তবে মনে হবে, আমি সংগ্রাম করেছিলাম, আমি জয়ী হয়েছি।

পাঠকদা' বিপত্নীক, সংসারে দুই পুত্র ছাড়া কেহ নাই।

পর দিন সকালে সন্ধ্যা-আহ্নিক শেষ করিয়া চাল-জল মুখে দিয়া তাঁহার ছোট দুইটি ছেলেকে ডাকিলেন। তাহারা সামনে আসিয়া দাঁড়াইলে কহিলেন। পয়সা কি কিছু আছে রে?

পুত্রদ্বয় নীরবে একটি ছোট হাঁড়ি আনিয়া ধরিল। পাঠকদা' নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, দুইটি পয়সা আছে।

—ঘরে চাল আছে রে?

—এ বেলার চাল আছে, তুমি যে তিন সের কাকে দিলে।

পাঠকদা' তাঁহার ফতুয়া গায়ে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ছেলেদের মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, চাল ক'টা এবেলা ফেনা-ভাত রেঁধে খেয়ো। আর আমি একটি পয়সা নিয়ে গেলাম ঘাট পার হতে হবে। এই একটি পয়সা, আর উপরে ভগবানকে রেখে গেলাম, 'তোরা বেঁচে থাকিস'। যদি ফিরি দেখা হবে—

পাঠকদা' স্মিতহাস্যে শচীনবাবু ও পুত্রদ্বয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রওনা হইলেন। ছেলে দুইটি একটি পয়সা সম্বল সেই হাঁড়িটা কোলো করিয়া বসিয়া রহিল। যেন পৃথিবী সমস্ত কালিমা কে তাহাদের মুখে মাখাইয়া দিয়াছে।

শচীনবাবুর চোখের সামনে আজও ভাসিয়া উঠে, জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম্য পথে পাঠকদা' চলিয়া যাইতেছেন, একবারও বাস্তুভিটাব দিকে, পুত্রদ্বয়েব পানে ফিরিয়া চাহিলেন না।

শচীনবাবুব অন্তর কাঁদিয়া উঠিল, এই ত্যাগ, এই সহিষ্ণুতা সবই ত ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। পাঠকদা'ব সে বিদায়েব দৃশ্য মনে পড়িলে আজও চোখে জল আসে।

কিন্তু তাঁহার ছেলেরা বাঁচিয়া ছিল। পাঠকদা' দুই বৎসব পবে ফিবিযা আসিয়াছিলেন। যে ভগবানের হাতে পুত্রদিগকে দিয়া গিযাছিলেন তিনি তাহাদের রক্ষা করিয়াছেন। পাঠকদা'ও ফিরিয়াছিলেন, শচীনবাবু মনে মনে প্রার্থনা করিলেন, যে ভগবান ঐ সাত বৎসরেব নিরুপায শিশু দুইটিকে বক্ষা করিযাছিলেন তিনিই যেন সত্যকেও বক্ষা কবেন। সত্য জয়ী হোক্, সত্য বেঁচে থাক্।

*

মীরা চা লইয়া আসিযা প্রশ্ন করিল, সত্য কি বলে গেল?

—কিছু না।

মীরা কাতরকণ্ঠে কহিল, না, আমাব কাছে কিছু গোপন কবো না। আমার মন বলছে কি যেন একটা অমঙ্গল হবে। সত্যি কবে বল

—সত্য স্বদেশী করতে যাচ্ছে, তাই প্রণাম কবে গেল।

—তোমাকে কেন? ঐজন্যেই বুঝি তোমাদের সমিতি হয়েছে?

—না, সমিতি সাহিত্য আলোচনাব জন্যে। তোমার ভয় নেই।

মীরা মিনতি করিয়া কহিল, না, তুমি ওসবের মাঝে যেও না। আমি কেমন করে একা লাট্টুকে নিয়ে থাকব? সত্যি করে বল তুমি ওদের দলে নেই—

শচীনবাবু হাসিয়া বলিলেন, সত্যিই নেই। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি।

মীরা চলিয়া গেল, কিন্তু শচীনবাবুর কথা বিশ্বাস করিয়াছে এমন মনে হইল না।

*

পরদিন শহরে হরতাল। সমস্ত হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের কতক দোকানপাট বন্ধ। স্কুল বন্ধ, ছাত্রছাত্রী কেহ স্কুলে যায় নাই। শচীনবাবু সকাল সকাল স্কুল হইতে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

তাহাব পরদিনও স্কুলগুলিতে ছাত্রাভাব, কর্ত্তৃপক্ষ সাত দিন ছুটি দেওয়া স্থির করিয়া সেই মর্ম্মে বিজ্ঞপ্তি দিয়াছেন। শহরের সর্ব্বত্রই একটা উত্তেজনা চলিয়াছে, স্কুলেব ছাত্র ও কয়েকজন যুবক নাকি পুলিশের মুখ হইতে সিগারেট কাড়িয়া ফেলিয়া দিযাছে, জনৈক দারোগাব বিদেশী টুপী কাড়িয়া লইয়া চৌমাথা রাস্তার উপব বহ্ন্যুৎসব করা হইয়াছে। পুলিশেরা নাকি তাহাদের মতে দেশদ্রোহী, তাহাদেব দেখিলে বিশ্বাসঘাতক, মীরজাফরের দল প্রভৃতি নানা বিশেষণে তাহাদিগকে নিবন্তর আপ্যায়িত করা হইতেছে।

স্কুল যখন হইলই না, তখন কিছু হিসাব-নিকাশের বাকী কাজগুলি সমাপ্ত করিয়াই যাইবেন স্থির কবিয়া শচীনবাবু কাজে বসিয়া গেলেন। হিসাব মিলাইতে মিলাইতে বেলা প্রায় বারটা হইয়া গেল। স্কুলের নয় অথচ মুখচেনা একটি যবক আসিয়া প্রণাম কবিল। শচীনবাবু কহিলেন, কি বাবা? কোন দরকার আছে—

—না, আপনাকে প্রণাম করতে এলাম।

—আমাকে কেন হঠাৎ?

—আমরা সত্যাগ্রহ করতে যাচ্ছি। মুনসেফবাবুকে কাপড় পরে আদালতে যাবার কথা বলেছিলাম তিনি শুনলেন না, তাই রাস্তায় সত্যাগ্রহ করা স্থির হয়েছে। লাঠি চার্জ্জ হবে মনে হয়—তাই। আশীর্ব্বাদ ক'রবেন, যেন সব সহ্য করতে পারি।

শচীনবাবু মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কে কে?

—সত্যদা আর আমরা নয় জন।

শচীনবাবু কহিলেন, আশীর্ব্বাদ করি জয়ী হও।

ছেলেটির নাম নরেন। সে পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

শচীনবাবু বিমনা অবস্থায় পুনরায় কাজে মন দিবেন এমনি সময় বাহিরে সহসা কাহারা হাঁকিল—বন্দে মাতরম্।

শচীনবাবু কলম রাখিয়া বাহিরে আসিলেন এবং উৎসুক ভাবে মোড়ের নিকটে পোষ্টাপিসের বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন। অদূরে মুনসেফবাবু আসিতেছেন, মোড়ের উপরে জনৈক দারোগা, কয়েকজন কনেষ্টবল লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

যুবকগণ ভয়হারী ধ্বনি করিতেছে—বন্দে মাতরম্।

মুনসেফবাবু আসিয়া পড়িলেন। এক জন কি যেন বলিল তিনি না শুনিয়াই অগ্রসর হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে দশ জন সত্যাগ্রহী রাস্তার উপর শুইয়া পড়িল। মুনসেফবাবু বিপদ গণিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে দারোগার আদেশে, পুলিশ লাঠি চালনা করিল। অসহায় নিরস্ত্র প্রতিবাদহীন দেহের উপর তীব্রবেগে লাঠি আসিয়া পড়িতেছে—সত্যাগ্রহীর দেহ তীব্রতর, অসহনীয় বেদনায় কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে বুটের লাথি। আঘাত সহনাতীত হইয়া উঠিল, দেহগুলি যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া বুটের আঘাতে দুই ধারের নয়ন-জুলির সঞ্চিত জলের মধ্যে গিয়া পড়িল।

রাস্তা পরিষ্কার হইয়াছে—মুনসেফবাবু অন্য পথে চলিয়া গেলেন। কর্ম্মসমাপনান্তে পুলিশবাহিনীও একটু সরিয়া গেল।

সত্য তাহার সহচরগণসহ রক্তাপ্লুত কর্দ্দমাক্ত দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাঁকিল—বন্দে মাতরম্।

সকলে হাঁকিল—বন্দে মাতরম্।

শচীনবাবু অশ্রুপুরিত চোখে চাহিয়া দেখিতেছিলেন—কেমন করিয়া তরুণ প্রাণগুলি এই অত্যাচারকে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিল।

সামনে যাইতেছে সত্য। তাহার কপাল বাহিয়া তখনও ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত পড়িতেছে, পিছনের কয়েকজনের জামা কাদায় ও রক্তে রাঙা হইয়া উঠিয়াছে।

সত্য হাঁকিল—স্বাধীন ভারতে অত্যাচারীর—

সকলে হাঁকিল—বিচার হবে। বিশ্বাসঘাতকের—বিচার হবে। দেশ-দ্রোহীর— বিচার হবে। বন্দে—মাতরম্, বন্দে—মাতরম্।

শহরের রাস্তা বাহিয়া তাহারা উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল।

শচীনবাবুব অন্তর থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছিল। সত্য, তোমার এই বক্তক্ষরণ এ কি ব্যর্থ হইবে! না জানি কত বেদনায় উহারা হাঁকিতেছে, 'বন্দে মাতরম্'। এই দুঃখ, এই লাঞ্ছনা এর কি কোন পুরস্কার নেই—সমগ্রজীবন কারাবাস ব্যতীত?

শচীনবাবুর চোখ জলে ভরিয়া উঠিতেছিল, অশ্রু মুছিয়া তিনি পথ চলিতে লাগিলেন কিন্তু বার বার মনে পড়িতেছিল .সত্যর রক্তাপ্লুত মুখখানি আর বীর-কণ্ঠের ধ্বনি 'বন্দে মাতরম্'—দেশদ্রোহীর বিচার হবে—

বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিতে ফিরিতে শচীনবাবু কত কি ভাবিতেছিলেন। পথের ধারেই কেরাণীকুলের মেস। হরিদা' ডাক দিলেন—শচীনবাবু তামাক খেয়ে যান।

শচীনবাবু ধূমপানেব জন্য থামিলেন। একটা বেতের মোড়ায় বসিয়া সুগন্ধি তামাক টানিতেছিলেন। সত্যর জন্য মনটা তাঁর বার বার কাঁদিয়া উঠিতেছিল। হরিদা' নীরবে বসিয়া আছেন।

শচীনবাবু কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করিলেন—সামনের চৌকিতে একটি কনষ্টেবল বসিয়া আছে। গালপাট্টা দাড়ি—ভোজপুরী না হয় গয়া

মজঃফরপুরী হইবে। সে বাহিরের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া কি যেন ভাবিতেছে। সেও সম্ভবতঃ শচীনবাবুকে লক্ষ্য করে নাই—এমনি ভাবে চাহিয়া আছে।

শচীনবাবু হঠাৎ লক্ষ্য করিলেন, তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

কিন্তু পুলিশের চোখে জল কেন সেকথা জিজ্ঞাসা করিবার মত মনোভাব তাঁহার ছিল না, তাই তিনি প্রশ্নও করিলেন না।

সে হঠাৎ কহিল, নোকরী ছোড় দেগা বাবুজী।

হরিদা' কহিলেন, নকরী ছোড় দেগা—তেওয়ারী।

—জরুর দেগা, আমি ছোড় দেগা।

হরিদা' প্রশ্ন করিলেন, কেন? তেওয়ারী হিন্দীতে জবাব দিল, এমনি করে ছেলেছোকরাদের মারবার জন্যই কি চাক্‌রী? এ কাজ করতে পারব না, আমারও এমনি বেটা আছে। চোর নয়, ডাকাত নয়, বাবুলোক—এদের গায়ে লাঠি মারব পেটের দায়ে—এ নোকরী আমি করব না।

—বাড়ীর সব কি করবে?

—রামজী যা করাবেন।

—তোমার যে জেল হবে চাকরী ছাড়তে চাইলে।

—হবে হোক, বাবুরাও ত সব জেলেই যাবে।

শচীনবাবু নীরবে শুনিতেছিলেন—হরিদা চুপ করিলেন। তেওয়ারীর চোখ দিয়া তখনও জল পড়িতেছিল। সে অকস্মাৎ কাতর-কণ্ঠে কহিয়া উঠিল, ইসসা নকরী হাম ক্যায়সে করেঙ্গে বাবুজী? ছেড়ে দেগা নোকরী—এ নেমকহারামী হ্যায়।

তেওয়ারী চোখের জল মুছিয়া উত্তেজিত ভাবে চলিয়া গেল। শচীনবাবুর মনটি যেন প্রসন্ন হইল—সত্য আঘাত পাইয়া নির্ভীক কণ্ঠে

হাঁকিতেছে বন্দে মাতরম্, আর এই তেওয়ারী আঘাত দিয়া কাঁদিতেছে। তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন—সত্য, তোমার জয় হোক।

শচীনবাবু হুঁকা রাখিযা আবাব উঠিলেন।

*

মোডেব মাথায দাঁড়াইয়া দারোগা ও আর একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর কথা হইতেছিল। দাবোগা মামুদ হোসেন বলিতেছে, কায়দামত একটু আধটু গুলি চালাতে যদি পারতাম তা হলে হয়ত প্রমোশনটা তাড়া-তাডি হ'ত। এমনিধারা লাঠি চালিযে কি কিছু হয়।—সিগারেটের একবাশ ধোঁয়া ছাডিয়া তিনি ঈষৎ হাসিলেন, যুদ্ধে জিতিয়া শিবিরে বসিযা যেন আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন।

অন্য ভদ্রলোক কহিলেন, বন্দুক ত চালাবে, কিন্তু বযে সযে, মানুষ মাবা যত সোজা ভাবো আসলে ততটা নয।

—হ্যাঁ, কি হবে? ওতে আমার মন টলে না।

একটি ঢিল আসিযা তাহাব গাযে পড়িল। ফিরিয়া চাহিতেই দেখেন একটা দশ বছবের বালক তাঁহাব পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিযা উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছে—মিরজাফর—নেমকহারাম মামুদ হোসেন—তাহাকে বেবনেট হাতে তাডা কবিযা গেলেন, কিন্তু সে যেন নিমেষে ভোজবাজীর মত অদৃশ্য হইয়া গেল।

শচীনবাবু জানেন—তাদের স্কুলে ক্লাস থ্রিতে পড়ে ছেলেটি। তাহাব হাসি পাইল—গণেশ সাধ্যমত প্রতিবাদ করিয়াছে বৈ কি?

*

বাসায় ফিরিতেই মীরা দরজা খুলিয়া দিয়া প্রশ্ন করিল, শহরে কিসের গোলমাল হচ্ছে গো?

—স্বদেশী গোলমাল।

—কি হয়েছে ভাল করে বল।

শচীনবাবু যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা শুনিয়াছেন তাহা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। তখনও চোখের উপর ভাসিতেছে সত্যর দল রক্তাক্ত দেহে মাটিতে শুইয়া উচ্চকণ্ঠে হাঁকিতেছে বন্দেমাতরম্—

মীরা সহানুভূতির সঙ্গে কহিল, সত্যর খুব লেগেছে না গো? অনেকটা কেটে গেছে? কেন এমন করে মারে?

—চাকরির উন্নতি হবে বলে।

—ছিঃ, ওরা এমন অমানুষ কেন? ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেই ত পারত, মারলে কেন? ওদের কি ছেলেপুলে নেই?

শচীনবাবু করুণ হাসি হাসিলেন—ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, এ ত সবে আরম্ভ, আবও কত কি হবে তা কে জানে।

—না না, সত্যকে বারণ কর, এমনি ক'রে মার খেয়ে কি হবে?

—সে ত মার খেয়ে মরবে বলেই নেমেছে, তাকে বারণ করে কি হবে?

মীরা সভয়ে কম্পিতকণ্ঠে কহিল, ষাট, ষাট, অমন কথা বলো না। সত্যর মত ঠাণ্ডা ছেলে, তার এ কেমনতর জেদ!

শচীনবাবু জবাব দিলেন না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, তিনটে মাত্র, তা হোক, একটু চা কর ত।

মীবা চা করিতে গেল। শচীনবাবুর চোখের সামনে লাঠি চালনার দৃশ্যটা বারবার ভাসিয়া উঠিতেছিল এবং মনটা বেদনায় ভারাক্রান্তই শুধু নয় বিদ্রোহীও হইয়া উঠিতেছিল।

গার্ল স্কুলের দপ্তরী আসিয়া একখানি পত্র দিল, মিস্ রায় লিখিয়াছেন—

প্রিয় শচীনবাবু,

অবিলম্বে একবার দেখা করিবেন। পাঁচটা হইতে ছ'টা পর্য্যন্ত আপিসে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। যত কাজই থাক, নিশ্চয়ই আসিবেন। ইতি—

আপনাদের
অণিমা রায়

মনটা বিষণ্ণ ছিল, মিস্ রায়ের জরুরী আহ্বানেও মেঘ কাটিল না, কিন্তু দেখা করার যে একান্ত প্রয়োজন তাহা শচীনবাবু ভাল করিয়াই বুঝিলেন।

*

বিকালে শচীনবাবু বাহির হইয়াছিলেন।

পথে সত্যর সহিত দেখা, সে চায়ের দোকানে চা খাইতেছিল, শচীনবাবু চা পান করিবার অজুহাতে দোকানে ঢুকিয়া সত্যর পাশেই বসিয়া পড়িলেন এবং দু'একটা কথাবার্ত্তার পর তাহার আঘাত সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। সত্য সহাস্য মুখে জানাইল, না স্যার, সে রকম কিছু লাগে নি, সব ক'টাই হাতের উপর দিয়ে গেছে, একটা মাথায় লেগে সামান্য কেটেছে।

শচীনবাবু ক্ষত ও স্ফীতিগুলি ভালো করিয়া দেখিতে লাগিলেন। সত্য কহিল, ও কিছু না স্যার। তবে বেশী দিন বোধ হয় বাইরে থাকতে পারব না এই যা দুঃখ। কাগজ পড়ছেন—কেমন সুরু হয়েছে সব।

শচানবাবু চলিয়া আসিলেন দুঃখিত অন্তঃকরণে, কিন্তু হৃদয় তাহার একটা নূতন প্রেরণায় ভরিয়া উঠিল—যে মৃত্যুকে মানুষ এত ভয় করে প্রকৃতই অবস্থাবিশেষে তা এমন ভয়াবহ নয়, সত্য সে ভয়কে এড়াইয়াছে, সে যেমন করিয়াই হোক্…

অণিমা রায় আপিসেই ছিলেন। শচীনবাবুকে দেখিয়া কহিলেন, এত দেরী করতে হয় ছিঃ! কতক্ষণ বসে আছি। সত্য কেমন আছে? খুব লেগেছে—

—তেমন নয়, তবে খানিকটা চোট লেগেছে।

শচীনবাবু তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া চুপ করিলেন। অণিমা কিছুক্ষণ নির্ব্বাক থাকিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, ওরা কেমন করে এমন ভয়শূন্য হয়েছে জানেন?

—জানি, তাদের ধ্রুব বিশ্বাস তারা ভারতের স্বাধীনতা ফিরিয়ে

আনবে, সগর্ব্বে তখন তারা বলবে আমরা স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছি, আমরা দেশমাতৃকার সেবক। এই আকাঙ্ক্ষা তাদের মন থেকে সব দুর্ভাবনা দূর করেছে।

অণিমা কহিলেন, সত্যর অন্তরে যে এই সাহস ও শক্তি ছিল তা কোন দিন ভাবতে পেরেছেন ?

—না। এটা বাস্তবিকই বিস্ময়কর !

অণিমা আরও ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমাদের কি কিছুই করবার নেই ? আমরা কি কেবল দর্শক ?

—হ্যাঁ, নিরপেক্ষ দর্শক।

অণিমা একটু বিচলিত ভাবে কহিলেন, সত্য আমার টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, প্রয়োজন হলেই চাইব তখন দিয়ে কুলোতে পারবেন না। সে কি এইজন্যেই ? সে টাকা ত আপনি ফেরত দিয়ে যান।

—আমি জানি না। তবে এ কাজের জন্য হওয়া বিচিত্র নয়। টাকার তাদের প্রয়োজন হবেই—মানুষ, রক্ত ও অর্থ এ তিনটেই তাদের মূলধন।

অণিমা কহিলেন, আমার যথাসাধ্য আমি দেব, কিন্তু কেমন করে দেব, কাকে দেব তা ত আমি জানি না। আপনি প্রয়োজন হলে চাইবেন।

—আমি কে ? আমি কেন চাইব ?

অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিয়া মিস্ রায় কহিলেন, আমি মেয়েছেলে বটে, কিন্তু পেটে আমার কথা থাকে। আমাকে বিশ্বাস করুন।

বিশ্বাস করি।

—তবে কেন ছেলেভুলানো কথা বলেন ? আপনি সত্যদের সবকিছু জানেন। আমি জানি, সে যেরূপ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনার নাম করে তাতে আপনার আদেশ ব্যতীত সে নিশ্চয়ই কিছু করে নি। আপনি তাদের নেতা !

—আমি? অবাক করলেন! আমি আজ প্রথম শুনলাম যে সত্য এই ব্রতে ব্রতী।

অণিমা রায় হাসিলেন, কিন্তু মনে হইল তিনি শচীনবাবুর কোন কথা বিশ্বাস করিলেন না। সহাস্যে কহিলেন, যা হোক, একটা কথা বলি আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অকৃত্রিম তাতে আপনি সন্দেহ করবেন না, আর আমার অর্থ আপনার আদেশেই ব্যয়িত হবে।

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়াছিলেন, স্মিতহাস্যে কহিলেন, শ্রদ্ধার বদলে যদি অন্য কোন কথার দ্বারা আপনার মনোভাব প্রকাশ হ'ত?

—কি কথা? মিস্ রায়ের যেন একটু ভাবান্তর দেখা গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া কহিলেন, দাঁড়ান চা নিয়ে আসি। বলিয়াই চলিয়া গেলেন।

শচীনবাবু স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছিলেন—চারি পাশের ঘটনা প্রবাহ তাঁহাকে কোথায় ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে! এই মেয়েটির কথাগুলিও যেন হেঁয়ালিপূর্ণ।

চা আসিল। চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু কহিলেন, আপনার ব্যাপার ক্রমেই রহস্যময় হয়ে উঠছে, মনে হচ্ছে আপনিও সত্যব মতই বিপ্লবী, মুখে অজ্ঞতার ভান করে আমাদের মত নিরীহ মানুষকে বিভ্রান্ত করেন।

—থাক ওসব কথা। কথায় কথা বাড়ে।

—আমার অনুরোধ, সত্য কথাই বলবেন, সত্যের অভিনয় করবেন না।

—আপনার আসল লোভ কোথায় সে আমি জানি—তা আমার ক্যাসবাক্সেরই প্রতি।

অণিমা রায়ের কথা শুনিয়া শচীনবাবু ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিলেন, তার পর বলিলেন, নমস্কার, এর পরে এ জায়গা ত্যাগ করাই বোধ হয় সমীচীন।

*

পরদিন শচীনবাবু মোড়ের মাথায় প্রেসে বসিয়া স্কুল ম্যাগাজিনের কাজ করিতেছিলেন হঠাৎ রাস্তায় একটা গোলমাল শুনিয়া তাকাইলেন। একটি শোভাযাত্রা যাইতেছে। সঙ্গে লিখিত বিজ্ঞপ্তি—পঞ্চমবাহিনী ধ্বংস হোক, জাপানকে রুখতে হবে। জনকয়েক তরুণ ও কয়েকটি দশ-এগার বৎসর বয়সের বালিকার শোভাযাত্রা। সর্ব্বসাকুল্যে জনকুড়ি হইবে। জনৈক ভদ্রলোক মন্তব্য করিলেন—এ সব মেয়েরা রুখবে জাপানকে? বড়সড় হলেও না হয় কোমরে আঁচল জড়িয়ে রুখে দাঁড়াতে পারত।

শচীনবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পথের লোক শোভাযাত্রার নমুনা দেখিয়া হাসিতেছে।

একজন কহিলেন, জাপানকে রুখতে হবে তা এখানে কি? সিঙ্গাপুর যাও।

অপর ব্যক্তি কহিলেন, কমই-উনি-ইষ্ট পার্টির শোভাযাত্রা!

যাহাই হউক শচীনবাবুর আর কাজ করিতে ইচ্ছা ছিল না, তিনি বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত; বলিলেন, আপনার নাম শুনে আলাপ করতে এলাম।

ভদ্রলোক মুখ-চেনা। নাম মণিবাবু। শচীনবাবু সাগ্রহে কহিলেন, বসুন, বসুন। আপনি দয়া করে এসেছেন সে পরম সৌভাগ্যের কথা।

চা পানের ফাঁকে ফাঁকে আলোচনা চলিতেছিল। মণিবাবু কহিলেন, ইস্কুল ত বন্ধই, আপনারও পড়াশুনোর এখন প্রচুর অবসর, আমাদের 'জনযুদ্ধ' এখন পড়ুন না, দু'চারখানা। এই যে শিক্ষার অবস্থা, স্কুল কলেজ বন্ধ করে স্বদেশী করা এর কি কোন মানে হয়—এর দ্বারা কি হবে?

শচীনবাবু কহিলেন, ছুটি পেলাম, বেশ নিশ্চিন্তে দিনগুলো যাচ্ছে। এইটেই লাভ। ছেলেরাও একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।

—একে কি বিপ্লব বলবেন? এটা ত একটা হুজুগ।

—হুজুগ না হলে কি বিপ্লব হয়? শান্ত মনে বিচাব করে কাজ কবে সবাই, কিন্তু বিপদের মধ্যে যেতে পাবে ক'জন?

- যুদ্ধটা আপনার কি বলে মনে হয়? এটা ··

এটা অকৃত্রিম যুদ্ধ।

—এব কারণ?

—ব্রিটেনেব পক্ষে যুদ্ধে নামা সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য, জাপানের সাম্রাজ্য অর্জ্জনের জন্য, আমেরিকাব কিছু সুবিধে করে নেওয়ার জন্য, এমনি···

—এটা জনযুদ্ধ, যাকে বলে ক্লাস ষ্ট্রাগল। ফ্যাসিজম চায় শ্রমিক ও কৃষককে নিষ্পিষ্ট করে আপনার স্বার্থসিদ্ধি করতে, রাশিয়া তাব বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। এ যুদ্ধে যদি মিত্রশক্তি জিততে পারে তবে পৃথিবীর সকলেরই মুক্তি হবে—সকলেই স্বাধীন হবে, সুখী হবে।

শচীনবাবু হাসিয়া বলিলেন, তা হবে না। মানুষ সুখী কোন দিনই হবে না, ধনসম্পত্তির সমান ভাগের উপর সুখ দুঃখ নির্ভর করে না, তা হলে জগতে বড়লোকেরা অসুখী হ'ত না।

—আব যাই হোক রাশিয়া ত সাম্রাজ্যের জন্যে যুদ্ধ করছে না— it is for the people.

—নিজের লাভ না দেখলে কেউ যুদ্ধ করে না—এই আমার ধারণা।

—কিন্তু এই জনযুদ্ধের বিরুদ্ধে যারা পঞ্চমবাহিনীর কাজ করছে তারা কত বড় বিশ্বাসঘাতক।

—এটা জনযুদ্ধ নয়, এর বিরুদ্ধে কাজ করাটাও তাই বিশ্বাসঘাতকতা নয়। এটা সাম্রাজ্যবাদীর যুদ্ধ, যারা এতে সহায়তা করবে তারা সাম্রাজ্যের ভিত পাকা করে দেবে। রাশিয়া যদি জনগণের জন্যই যুদ্ধ

করে থাকে তা হলেও ভারতবাসীর সাহায্যের চৌদ্দ আনা যাবে সাম্রাজ্য-বাদের খাতে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি যুদ্ধ-বিপ্লব এসব কিছুই পছন্দ করি না। খাও দাও পড়াশুনো করো এই চাই ·

—তবে, আপনার ত শান্তির জন্যে চেষ্টা করা উচিত?

—আমার? তা হলেই ত অশান্তি ডেকে আনব, দরকার কি আমার অত শত দিয়ে।

—তবুও দেশের প্রতি আপনার একটা কর্ত্তব্য রয়েছে।

—কিছু নয়। যেহেতু দেশ আমার প্রতি কোন কর্ত্তব্য করে নি। নইলে···যাক সে কথা।

মণিবাবু হাসিয়া কহিলেন, ওটা অভিমানের কথা। আমি যতদূর জানি আপনার কথাই কেবল ছেলেরা শোনে, এ ক্ষেত্রে আপনারই উচিত তাদের এই সমস্ত বিপ্লবাত্মক ব্যাপার থেকে নিবৃত্ত করা। যাক্ আমি আমাদের পত্রিকা পাঠিয়ে দেব, বইও দেব কিছু কিছু পড়ে দেখবেন।

—তা দেবেন। সাম্যবাদ সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু পড়েছি, এবং মনে মনে লেনিন, ষ্ট্যালিন প্রভৃতিকে সত্যই শ্রদ্ধা করি। তাঁরা রাশিয়ার অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধন করেছেন।

মণিবাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন, তা ত বটেই।

মণিবাবু প্রস্থান করিলেন।

*

পরদিন সকালে মীরা চা লইয়া আসিয়া শচীনবাবুর সামনের চেয়ারখানায় চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শচীনবাবু গত কয়দিনের ঘটনাগুলির কথা ভাবিতেছিলেন, ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার কি আজ কোন কর্ত্তব্য নাই? তিনি কি শুধু নিরপেক্ষ দর্শকমাত্র?

অকস্মাৎ মীরাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, কি বসে রইলে যে, কিছু বলবে ?

—ওরা সকলে বলছে, সত্য তোমার এখানে যেরূপ আসা-যাওয়া করে তাতে তোমাকেই পুলিশ ধরতে পারে।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, সত্য দোকানে চা খায়, দোকানীকেও ধরবে তা হলে।

—না, তোমাকে ধরবে বলছে সকলে।

—ধরলে কি করব, তুমি থেকো লাটুকে নিয়ে।

—সে কেমন করে হবে, আমি পারব না। তুমি এমনি ভাবে ভাসিযে দিয়ে যাবে—

সিঁড়িতে চটির শব্দ হইল—গীতা ও অঞ্জলি আসিতেছে।

তাহারা আসিয়াই কহিল, বৌদি আমাদের চা ? চলুন চা নিয়ে আসি।

গীতা ও অঞ্জলি মীরাকে লইয়া অন্দরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সত্য আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, স্যার, আজ আমাদের মিছিল বেরুবে, আর শহরে হরতাল তা তো জানেনই। চারটায় মিটিং হবে—যাবেন ?

—হ্যাঁ যাবো বই কি।

সত্য হাসিয়া কহিল, আমি ত কয়েক দিনের মধ্যেই ডুব দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনাকে একটা কাজ করতে হবে। বৃথা জড়াতে চাইনে আপনাকে, কিন্তু এ কাজ যে আপনি ছাড়া আর কাউকে দিয়ে হবে না।

—আমি ?

—হ্যাঁ, আপনি। আপনি ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করতে পারি না আমরা।

—কি কাজ ?

—আমাদের টাকা পয়সা কিছু আছে এবং আরও আসবে। আপনার কাছে এগুলো গচ্ছিত রাখতে চাই।

সত্য কয়েকটি ছেলে ও মেয়েব নাম করিয়া কহিল, এরা টাকা চাইলে দেবেন এবং এনে দিলে রাখবেন। অন্য কেউ দিলেও রাখবেন—এই মাত্র। গীতা আর অঞ্জলি বইল তাবা সাহায্য কবতে পাববে।

শচীনবাবু স্মিতহাস্যে কহিলেন, হ্যাঁ শুনেছি এসব টাকা নিয়ে অনেকে ফেঁপে গেছে, এবাব যদি দুঃখ ঘোচে—

সত্য হাসিযা কহিল, আপনি ছাড়া আব কাউকে বিশ্বাস কবতে পারি না।

তাহার পর চিঠিপত্রের সাঙ্কেতিক একটা পবিভাষা সে বুঝাইযা দিযা কহিল, আমবা এমনি ভাবে সংবাদ দেব, নইলে বিপদ আছে। পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহিব কবিযা কহিল, এই ত নির্দ্দেশ। দু'চাব জন মরবেই, অতএব সতর্কভাবে কাজ কবতে হবে আমাদেব 'ডু অব ডাই' হচ্ছে নির্দ্দেশ—

গীতা ও অঞ্জলি আসিযা কহিল, মিছিলেব পুবোভাগে আমরা থাকব আজ স্যার, তাই আপনাব পদধূলি মাথায দিযে যাই।

তাহাবা প্রণাম কবিল।

—আশীর্ব্বাদ করবেন।

শচীনবাবু মাথায হাত দিযা আশীর্ব্বাদ কবিলেন। সকলে চলিযা গেল।

একটু পবে তিনি ভাবিযা দেখিলেন—ইচ্ছায হউক অনিচ্ছায হউক তিনি সত্যর কথামত কাজ করিযা যাইতেছেন এবং করিবার প্রতিশ্রুতি না দিলেও তাহারা বিশ্বাস করিয়া গিয়াছে যে তাহাদেব কাজ তিনি করিবেনই। এত বড় বিশ্বাসেব ভিত্তিমূলে তিনি কেমন কবিযা আঘাত হানিবেন ?

*

অপরাহ্নের দিকে মিছিল বাহির হইল।

পুরোভাগে গীতা ও অঞ্জলি জাতীয় পতাকা হস্তে—পিছনে শতাধিক মহিলা। তাহার পর দুই সহস্রাধিক লোক। কণ্ঠে তাহাদের তূর্য্যধ্বনির ন্যায় নিনাদিত হইতেছে—বন্দে মাতরম্, ভারত ছাড়ো। শচীনবাবুর সম্মুখ দিয়া শোভাযাত্রা চলিতে লাগিল, কিন্তু সত্য কোথায়? বহুক্ষণ খুঁজিয়া তিনি তাহাকে পাইলেন, পাশে পাশে যাইয়া শোভাযাত্রাকে সে পরিচালনা করিতেছে।

মোড়ের মাথায় পুলিশের বিরাট বাহিনী—শচীনবাবুর বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। ভাবিল নিরস্ত্র এই জনতার উপর গুলীবর্ষণ হইবে। গীতা অঞ্জলি এরা যে পুরোভাগে!

ধ্বনি হইতেছে—ভারত ছাড়। কিন্তু যাহারা এতদিন ভারতকে নিঃশেষে শোষণ করিয়া পুষ্ট হইয়াছে, তাহারা কি সে মধুভাণ্ড স্বেচ্ছায় সুবোধ বালকের মত ত্যাগ করিবে? যদিই তাহারা যায় তবে সর্ব্বনাশ করিয়া দিয়া যাইবে।

শচীনবাবু শঙ্কাব্যাকুল চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। না জানি মোড়ের মাথায় কি বিপর্য্যয় ঘটিবে।

মিছিল ধীরে ধীরে মোড় অতিক্রম করিয়া চলিল, পুলিশ বাধা দিল না। মিছিলের একাংশ ধ্বনি তুলিল, 'স্বাধীন ভারতে বিশ্বাসঘাতকের'—অন্য অংশ প্রতিধ্বনি করিল—'বিচার হবে।'

পুলিসবাহিনীর অফিসারদের মুখে একটু হাসির রেখা খেলিয়া গেল।

মিছিল নির্ব্বিঘ্নে শহর পরিক্রমা করিয়া মাঠে সমবেত হইল। সভা আরম্ভ হইল। অনেকে বক্তৃতা দিলেন।

সকলের শেষে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সত্য বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল, তাহা যেমন আন্তরিকতাপূর্ণ তেমনি জ্বালাময়ী ভাষায় দৃপ্ত। তাহা জনগণের

মনে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করিতে লাগিল। আজ দেশের সম্মুখে যে বিরাট কর্ত্তব্য রহিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া জীবনপণে স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য সে শ্রোতৃমণ্ডলীকে আহ্বান করিল। বলুন আপনারা, বন্দেমাতরম্ …বন্দেমাতরম্…ভারত ছাড়। জীবনপণে…স্বাধীনতা চাই—

সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি ইষ্টকখণ্ড সভাস্থলে পতিত হইল, সত্যকে লক্ষ্য করিয়াই তাহা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজনকে আহত করিল। পরক্ষণেই একখানা ছোট ইট আসিয়া সত্যর কপালে লাগিল, দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ রক্তাপ্লুত হইয়া গেল। সে পড়িয়া গেল।

একটা সোরগোল হইয়া সভা ভাঙ্গিয়া গেল। কতকগুলি লোক ছুটিল —কম্যুনিষ্টরা ঢিল মারিয়াছে সভা পণ্ড করিতে—অদূরে বটবৃক্ষের তলায় কতকগুলি লোক লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তাহারা আক্রমণ করিল। একটা অনির্দ্দিষ্ট অনিয়ন্ত্রিত হট্টগোলের মাঝে মারামারি হইয়া গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মাঠ জনশূন্য হইয়া পড়িল।

শচীনবাবু ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিতেছিলেন—এই জনসমুদ্রে কোথায় সত্য, কোথায় গীতা, কোথায় অঞ্জলি।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, রাস্তার মাঝে মাঝে অন্ধকার জমিয়া উঠিয়াছে ; মিউনিসিপালিটির ক্ষীণ আলোকে তাহা গাঢ়তর বলিয়া মনে হইতেছে। অন্ধকারে হঠাৎ একটি ছেলে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শচীনবাবু কহিলেন, কে ?

—আমি বিমল স্যার। সত্যদার তেমন লাগে নি, দিদিরা ভালই আছেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—আর ?

—কিছু কিছু জখম হয়েছে উভয় পক্ষে, তবে তা গুরুতর কিছু নয়— বিমল ত্বরিতপদে চলিয়া গেল।

শচীনবাবু আর একটু আগাইয়াই দেখেন লাঠি হাতে কয়েকটি যুবক

উত্তেজিত ভাবে ছুটিতেছে। কাহারও প্রশ্নের উত্তরে একজন বলিল, দেখি ওদের একটাকে খুন করবই—

তাহারা ছুটিয়া চলিয়া গেল।

একদল কনেষ্টবল বেটন হাতে দ্রুত মার্চ করিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু ধীরে ধীরে বাড়ীতে আসিয়া পৌছিলেন।

রাত্রি হইযাছে, মীরা আলোর সামনে লাট্টুকে কোলে করিয়া বসিয়া আছে। শচীনবাবু আসিতেই মীরা কহিল, কোথায় ছিলে? এত গোলমাল, আমি ভেবে ভেবে সারা হচ্ছি—

শচীনবাবু কহিলেন, সকলে বেড়াচ্ছে আর আমি বেড়াতে বেরুলেই তোমাব ভাবনা—

—মারামারি হচ্ছে যে?

—আমি কি মারামারি করতে গেছি? অত ব্যস্ত হলে চলবে কেন?

লাট্টু কহিল, বাবা, আমাকে একটা নিশান বানিয়ে দেবে আমি বন্দেমাতলম্ বলবো—

শচীনবাবু সস্নেহে তাহাকে কহিলেন, দেব বাবা। কাল সকালে বানিয়ে দেব।

মীরা খাবার আনিতে গেল। শচীনবাবু বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিলেন —ইহা ত আরম্ভ মাত্র, কেবলমাত্র সবকার নয়, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল লোকগুলির সঙ্গেও সমানে যুঝিতে হইবে। এঁরা সবাই ভারতীয়— কোথায় ইংরেজ, সমগ্র শহরে ত একটিও ইংরেজ নাই। এত শত্রু ঘরে বাহিরে এর মধ্যে সত্য ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, আজ তাহার কপালে দেশের ভাইদেরই দেওয়া রক্ততিলক।

…এই রক্ততিলকের ইতিহাস যেদিন লেখা হইবে সেদিন সত্যের স্থান কোথায় নির্দ্দিষ্ট হইবে? স্বাধীন ভারতের স্বপ্নই সে দেখিয়াছে কিন্তু তাহার বাস্তব রূপ কি দেখিতে পাইবে? দেশমাতৃকার চরণতলে আত্ম-

বিসর্জ্জন দিবে কত কর্ম্মী, কত বীর, কত অজ্ঞাত অখ্যাত প্রাণ। তাহারা কি পাইবে, কি পাইয়াছে? শচীনবাবু তো নির্ব্বিকার দর্শকমাত্র!

মীরা খাবার লইয়া আসিয়া কহিল, কি ভাবছ? স্কুল ত বন্ধ আছে, চল আমরা দেশের বাড়ীতে যাই।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, কোথায় যাবে? সর্ব্বত্রই এই গোলমাল।

মীরা ভীতভাবে কহিল, কিন্তু কি হবে? যদি তোমাকে ধরে? তুমি ওর মাঝে যেও না লক্ষ্মীটি।

—না না। আমি যাই নি, যাব না—তুমি বিশ্বাস কর। তোমাকে আর খোকাকে ফেলে আমি কোথায় যাব?

*

পরদিন সকালে সংবাদ পাওয়া গেল—

সত্যদের দলের বিশিষ্ট কর্ম্মী নগেন রাত্রে বহিরাগত কতকগুলি লোককে নৌকায় তুলিয়া দিয়া ফিরিবার পথে নেতা মণিবাবুর ভ্রাতার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আহত হইয়াছে। তাহাকে হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, কিন্তু অবস্থা আশঙ্কাজনক। নগেন মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজের জবানবন্দীতে নাকি তাহার নাম করিয়াছে এবং সমস্ত ঘটনাই বলিয়াছে।

বিপ্লববিরোধী কর্ম্মীরা সকলে রাতারাতি শহর ত্যাগ করিয়া গিয়াছে এবং সত্যদের দলের সব কয়জন বিশিষ্ট কর্ম্মীর নামেই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হইয়াছে।

গীতা সংবাদগুলি দিয়া কহিল, তাই সত্যদার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু খবর পাবেন।

—তোমরা?

এখনও দেরী আছে বলে মনে হয়। গীতা হাসিয়া কহিল, বেশীক্ষণ থাকলে আপনার বিপদ আছে। আমি যাই—

গীতা চলিয়া যাওয়ার পরে শচীনবাবু কিছুক্ষণ ভাবিয়া ধীরে ধীরে অণিমা রায়ের ওখানেই রওনা হইলেন। অণিমা আপিস-কক্ষেই একজন ভদ্রমহিলার সঙ্গে গল্প করিতেছিলেন। অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন, আসুন। অকস্মাৎ?

—হ্যাঁ, সাহিত্য সমিতির একটা অধিবেশনের আয়োজন করা দরকার তাই এলাম।

শ্রীমতী রায় পরিচয় করাইয়া দিলেন, ইনি মিস্ বসু, স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী।

—নমস্কার। আপনি নিশ্চযই সাহিত্য সমিতিব সভ্য হয়ে সমিতির গৌরব বৃদ্ধি করবেন।

অবান্তর কিছুক্ষণ আলাপেব পর মিস্ বসু বিদায় লইলেন। অণিমা বাথ সকল সংবাদই পাইয়াছিলেন, শচীনবাবু তথাপি আদ্যোপান্ত জানাইলেন।

শ্রীমতী রায় একটু চায়ের জোগাড় কবিযা আসিযা কহিলেন, এই গোলমালের মাঝে আবার সাহিত্য কেন?

মনটাকে চাঙ্গা করবার জন্যে···। একটা কাজের ভার সত্য দিয়ে গেছে। আমার কাছে তাদেব টাকাকড়ি সব গচ্ছিত রাখতে হবে এবং আমার উপরেই নাকি কেবল তারা আস্থা স্থাপন করতে পারে। ভাবছি এই সুযোগে যদি দারিদ্র্য ঘোচে, অনেকে ত বেশ গুছিয়ে নিচ্ছে।

শ্রীমতী রায় বলিলেন, ভাল পথই বেছে নিয়েছেন। আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।

শচীনবাবু বলিলেন, কিন্তু একটি কথা বুঝিনি, সেটা হচ্ছে দাতাই বা কে গ্রহীতাই বা কে? যারা সব ছিল জানা, তারা ত সব ফেরার? অবশ্য গ্রেপ্তারের ভয়ে নয়, কর্মী আটকা পড়লে কাজ পণ্ড হবে এই জন্যেই

ধরা পড়তে অনিচ্ছুক। শহর আপাততঃ নিষ্কণ্টক—কম্যুনিষ্টরা পলাতক, সত্যরা ফেরার।

শ্রীমতী রায় বলিলেন, তবে ত স্কুল খুলে দেওয়া যায়।

—হ্যাঁ, আমাদের স্কুল বোধ হয় দু'চার দিনের মধ্যেই খোলা যেতে পারে!

—ধন্যবাদ ।

কিছুক্ষণ অবান্তর আলাপ-আলোচনার পরে শ্রীমতী রায় বলিলেন, আপনাকে ভাল লোক বলেই জানতাম কিন্তু আপনার পেটে পেটে এত?

শচীনবাবু পরিহাস করিলেন, আমি নিরপরাধ—আমার পেটে কিছু নেই।

—আচ্ছা, টাকার বুঝি আপনার খুব বেশী প্রয়োজন হয়েছে?

—আমি—সরল মানুষ, আমাকে ব্যঙ্গ করবেন না।

সাহিত্য সমিতির সভার দিন নির্দ্ধারিত হইল, এবারের সভা হইবে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সেনের বাসায়। শচীনবাবু ফিরিয়া আসিলেন। এবার একটা জিনিষ তিনি লক্ষ্য করিলেন—মিস রায় আগেকার মত চঞ্চল হন নাই, আজ সম্ভবতঃ বুঝিয়াছেন যে ইহাই অনিবার্য্য পরিণতি।

*

বাসার সামনে একটি কনেষ্টবল দাঁড়াইয়াছিল, ঢুকিতেই সে কহিল, মাষ্টারবাবু, দারোগাবাবু আপনাকে ডেকেছেন।

—কে?

—মামুদ হোসেন সাহেব, দরকার আছে।

শচীনবাবুর সমস্ত অন্তর মুহূর্ত্তে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ চাপিতে পারিলেন না, কহিলেন, সময় নেই আমার, দরকার হলে তাঁকে আসতে বলো। সকালের দিকে বাসায় থাকি।

কনেষ্টবল সেলাম জানাইয়া চলিয়া গেল।

ঘরের মাঝে অঞ্জলি বসিয়াছিল। সে কহিল, দারোগার মেয়েব নাম রিজিয়া, তাকে পড়াতে বললে, না বলবেন না।

—না, আমি পড়াতে পারবো না।

অঞ্জলি কহিল, ওটা যে আমাদের দরকার স্যার!

—আচ্ছা ভেবে দেখব।

কিন্তু এই টিউশনি গ্রহণ করিতে মন কিছুতেই সায় দিতেছিল না। তাঁহাব সমস্ত অন্তব আজ ইহাদের উপর বিরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

পরদিন বাজাব করিয়া ফিরিযাছেন এমনি সময দারোগা সাহেব আসিয়া কহিলেন, শচীনবাবু, আমি আপনার শরণাপন্ন।

শচীনবাবু কহিলেন, যে দিনকাল তাতে ত ভয় হয়।

—না না, আপনার ভয় কি?

—ভূতেব ভয় ত? সকল জায়গারই আছে।

মামুদ হোসেন কিছুক্ষণ শহরের কথা আলাপ করিয়া মন্তব্য করিলেন, শুধু শুধু হাঙ্গামা করে লাভ কি? ব্রিটিশ শাসন কি এমনি ঠুনকো যে দুটো শোভাযাত্রা বা মিটিং করে তাকে ভাঙ্গা যায়?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, বিশেযতঃ আপনাদের মত একনিষ্ঠ কর্ম্মী থাকতে সেটা এক রকম অসম্ভবই।

মামুদ হোসেন আত্মপ্রসাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ হাসিলেন।

অবশেষে আসল প্রস্তাব করিলেন, মেয়েটা নাইনে পড়ছে, কিন্তু একটু কাঁচা। হাঙ্গামায় ত আর পড়াশুনো হবে না, আপনি যদি একটু দেখতেন—

শচীনবাবু সংক্ষেপে কহিলেন, আমাব সময় নেই—

—কেন? সন্ধ্যার সময়, এই ঘণ্টাখানেক?

—ওই একটু যা বিশ্রাম, তা না হ'লে মানুষ বাঁচে কি করে?

—হোক্ না, কয়েকটা মাস ত? তা ছাড়া শিক্ষক তো আরও আছেন, কিন্তু মেয়ের জেদ আপনার কাছেই পড়বে—

—কেন?

—কি জানি? তার ধারণা আপনি ছাড়া উপযুক্ত শিক্ষকই নেই। আপনাকে শ্রদ্ধা করে, কাজেই আপনার কাছে শিক্ষা নেবে। দারোগা হলেও এটুকু বুঝি, তা ছাড়া একমাত্র মেয়ে—

শচীনবাবু চিন্তা করিতেছিলেন। দারোগা সাহেব কহিলেন, যথাসাধ্য দেব, কুড়ি টাকা। আপনি আর অমত করবেন না। সেকেণ্ড ডিভিসনে গেলেও জলপানি পাবে—আমাদের সম্প্রদায়—

শচীনবাবু বলিলেন, আচ্ছা, একটা ভালো দিন দেখে আরম্ভ করা যাবে।

মামুদ হোসেন খুশী হইয়াই চলিয়া গেলেন।

*

বৃহস্পতিবারে শচীনবাবু নবতম ছাত্রীকে পড়াইতে দারোগা সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। দারোগা সাহেব মেয়েকে তাঁহার সামনে আনিয়া বলিলেন, এই আমার মেয়ে, রিজিয়া। অঙ্ক ইংরেজি দুটোতেই কাঁচা, কিন্তু আপনি ভার নিয়ে পড়ালে একটা স্কলারশিপ পেতেও পাবে।

পিতার প্রস্থানের পর রিজিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আপনি আমাকে পড়াতে রাজী হবেন ভাবি নি।

শচীনবাবু প্রথমতঃ বিস্মিত হইলেন প্রণামে, দ্বিতীয়তঃ তাহার এমনি স্বচ্ছন্দ সাবলীল কথায়। তিনি হাসিয়া কহিলেন, কেন?

—একে ত কোথায়ও গিয়ে পড়ান না, বিশেষতঃ মেয়েদের—তাই। আমাদের তৈরি চা খাবেন কি, নিয়ে আসব?

শচীনবাবু আমাদের কথাটা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাই বলিলেন, খাই,

তবে প্রয়োজন নেই। তোমার যদি খাওয়াবার প্রয়োজন থাকে আনতে পার।

রিজিয়া মুহূর্ত্তে চা ও বিস্কুট লইয়া ফিরিল। শচীনবাবু চা পান করিতে করিতে লক্ষ্য করিলেন, মেয়েটি সত্যই সুন্দরী। রিজিয়া হাসিয়া কহিল, আমাদের স্কুলের মেয়েরা বলে কি জানেন, আপনি যদি আমাদের সপ্তাহে অন্ততঃ দুটো দিনও পড়াতেন—

—আমি এমন কি পড়াই, তোমার দিদিমণিরা ত বেশ পড়ান।

—নাঃ, ছেলেরা আমাদের চেয়ে কত বেশী জানে। এমন সব কথা বলে যা শুনি নি। আমাকে কিন্তু নোট লিখিয়ে দিতে হবে।

তাহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য একটু অনুবাদ করিতে দিলেন, এবং কয়েকটা অঙ্ক মুখে মুখেই কষিতে দিলেন। কিন্তু রিজিয়া কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল, অঙ্ক কষিবার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ ছিল না শচীনবাবু তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া কহিলেন, অঙ্ক হচ্ছে ?

—হবে স্যার।

কিন্তু অঙ্ক হইল না। রিজিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কিছু বলবে আমাকে ?

রিজিয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, পুলিসের মেয়ে বলে কি আমাদের বিশ্বাস করেন না ?

—কেন করব না। আর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা কেন ?

রিজিয়া কহিল, প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস করবেন, আমি আপনার কথায় সব করতে পারব। শচীনবাবু চিন্তান্বিত হইয়া ফিরিলেন।

*

দুই এক সপ্তাহ চলিয়া গেল, শহরের অবস্থা শান্ত, মফঃস্বলে কিছু কিছু ধ্বংসমূলক কাজ চলিতেছে—অর্থাৎ কোথাও পোষ্ট আপিস পোড়ানো

হইতেছে, টেলিগ্রাফের তার কাটা চলিতেছে। কোথাও কোথাও শোভাযাত্রা পরিচালনা লইয়া পুলিসের সহিত সংঘর্ষ বাধিতেছে। শচীনবাবুর বুঝিতে বাকি রহিল না, শহরের বিপ্লবশক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহারই ফলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই সকল ঘটনা।

সত্যর সঙ্গে অনেক দিন দেখা নাই, কোথায় কেমন আছে তাহাও শচীনবাবু জানেন না। স্কুল খুলিয়া গিয়াছে, ভাল ছেলেমেয়েরা রীতিমত স্কুল করিতেছে, কয়েকটি মাত্র ছাত্র ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে বিপ্লব-বহ্নিতে, তাহারা স্কুলে আসে না—শহরের জীবনযাত্রা চলে ঠিক যেমনটি চলিত। মাছ দুধ আসে, বিক্রয় হয়, উকিল মোক্তারগণ কোর্টে যান, হাকিম বিচার করেন। বেকাররা সারাদিন আড্ডা দেয়। পথের যেখানটা সত্যদের রক্তে রাঙা হইয়াছিল সেখানে কেহ থমকিয়া দাঁড়ায় না, আপন মনে চলিয়া যায়। তাহাদের পায়ের তলার ধূলায় মিশিয়া থাকে রক্তের দাগ। শহরবাসী হয়ত ধীরে ধীরে ভুলিয়া যাইবে এ ক্ষুদ্র কাহিনী···

শচীনবাবু স্কুলে গিয়া একখানা পত্র পাইলেন—সত্য দেখা করিতে অনুরোধ জানাইয়াছে। আজ রাত্রে সে শহরের কোনও এক স্থানে আসিবে। শচীনবাবুকে জানাইয়াছে, তিনি বেড়াইয়া ফিরিবার পথে সন্ধ্যার পরে পায়ের কাছে দুইবার টর্চ্চের আলো পড়িলে আলো-নিক্ষেপকারীর সঙ্গে তিনি যেন চলিয়া আসেন, তাহা হইলেই দেখা হইবে।

এমনি ভাবে সংগোপনে যাওয়ার বিপদ না আছে এমন নয়। শচীনবাবুর মনের মধ্যে কেমন করিতেছিল, তবুও যাহারা জীবনপণ করিয়া ঘর ছাড়িয়া দুর্গম পথে বাহির হইয়াছে তাহাদের জন্য এটুকু করিতেই হইবে—তাহাদের এমন বিশ্বাসের অমর্য্যাদা করা চলে না।

বৈকালে শচীনবাবু একখানা বই হাতে করিয়া বাহির হইতেছিলেন।

নিত্যকার সঙ্গী রমণীবাবু, সুরেনবাবু, হরেনবাবু প্রভৃতি অন্যান্য শিক্ষকগণ সঙ্গে ছিলেন। একটা পুলের নিকটে পর পর দুই বার টর্চের আলো তাঁহাদের সম্মুখে পড়িল। শচীনবাবু বিদায় নিলেন—যাই পড়াতে হবে—

সঙ্গীদের নিকট বিদায় লইয়া শচীনবাবু আলোর রেখা অনুসরণ করিয়া চলিলেন—কিছুক্ষণ চলিয়া বুঝিলেন ছেলেটি অনিল। গত বৎসর পাস করিয়া গিয়াছে। দ্রুত পা চালাইয়া অনিলের সঙ্গ ধরিলেন এবং তাহার পিছন পিছন শহরের এক ডাক্তারের বাড়ীতে ঢুকিলেন। ভিতরবাড়ী অতিক্রম করিয়া শেষে রান্নাঘরের মাঝখান দিয়া তাহার পিছনে ছোট একটা কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

রান্নাঘরে একটি বর্ষীয়সী নারী উনুনে রুটি সেঁকিতেছিলেন, একটি তরুণী বধূ রুটি বেলিয়া দিতেছিল। শচীনবাবু সবিস্ময়ে দেখিলেন, তাহারা কেহ ঘোমটা টানিয়া দিল না, একটুও বিস্মিত হইল না, এমন কি মুখ তুলিয়া একবার চাহিয়া দেখিলও না, কে এই অপরিচিত ব্যক্তি তাহাদের রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, গৃহটি স্বল্পালোকিত, একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে। সত্য প্রণাম করিয়া কহিল, ভাল আছেন ত স্যার ?

—হ্যাঁ। তুমি কি করে এলে ?

সত্য এ কয়দিনে কোথায় কি কাজ চলিয়াছে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি দিতেছিল। তরুণী বধূটি আসিয়া কহিল, একটু চা দেব, মাষ্টার মশায় ?

—দিন্।

প্রণাম করিয়া সে কহিল, দিন্ না, দাও। আমাকে আপনি বলছেন কেন ?—সত্য চা খাবে ?

—খাবো বৈ কি ?

ঘরের মধ্যে বসিয়া এই পরিবেশটি শচীনবাবুর নিকট বড়ই রহস্যময়

বলিয়া মনে হইতেছিল। এই তরুণী বধূ কেমন করিয়া যেন সঙ্কোচ ও অকারণ লজ্জাকে ত্যাগ করিয়াছে—কেমন করিয়া অকুণ্ঠভাবে অপরিচিতকে অভ্যর্থনা করিয়াছে। সবই আশ্চর্য্য—

চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু শুনিতেছিলেন সত্য কহিতেছে, আমাদের সকলেই ত একে একে গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। আমারও সময় আসন্ন। কম্যুনিষ্ট পার্টির ওরা আমাদের মধ্যে কিছু কিছু ছিল, তারা এখন আমাদের গতিবিধি সম্বন্ধে সমস্ত খবরই পুলিসকে দিচ্ছে তাই সকলেই গ্রেপ্তার হয়ে গেছে। আমি বাকী আছি, কিন্তু আর ত বিশ্বাস করতে পারি না কাউকে, কাজেই একথা নিশ্চিত যে গ্রেপ্তার আমি হবই। এরা যদি সন্ধান না দিত তবে পুলিসের সাধ্য কি আমাদের খোঁজ পায়।

সত্য কতকগুলি ছেলে ও মেয়ের নাম করিয়া সাবধান করিয়া দিল, এরা সকলেই প্রচ্ছন্ন কম্যুনিষ্ট, আমাদের বিপ্লবকে নষ্ট করতে আমাদের দলে ঢুকেছিল। কাজেই আমাদের ইঙ্গিত ব্যতীত কারও কাছে কিছু বলবেন না, কাউকে বিশ্বাস করবেন না।

শচীনবাবু বসিয়া বসিয়া শুনিলেন।

সত্য বলিল, এখানে আর কাজ করা সম্ভব নয়—এখন অন্য জেলায় যাবো। সামনের ২৬।২৭ তারিখে সেখানে যাব, সেখানে কাজ হয়ত চলতে পারে···

একটু থামিয়া সে কহিল, আপাততঃ কাল বিকেলের মধ্যে ৩০৲ টাকা আমার চাই। টাকা আছে কিনা জানি না, কিন্তু কাল সন্ধ্যার মাঝে না পেলে আমার চলবে না। এখানে চব্বিশ ঘণ্টা থাকলেই ধরা পড়তে হবে। আর বেশী কিছু আমি বলতে চাই নে স্যার! সন্ধ্যায় অনিল খেলার মাঠে যাবে···

ফিরিবার সময় সত্য প্রণাম করিয়া কহিল, আশীর্ব্বাদ করবেন স্যার।

হ্যাঁ, আর এক কথা, আপনি যেখানেই যান যার সঙ্গেই মেশেন, সাবধান থাকবেন।

শচীনবাবু হাসিয়া কহিলেন, পুলিসের চেয়ে দলবিশেষের ভীতিই দেখ্‌ছি প্রবল হয়েছে তোমাদের ?

—তা হবেও বা।

সত্যকে আশীর্ব্বাদ করিয়া শচীনবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। কিন্তু রান্নাঘর হইতে বাহির হইতেই স্বয়ং ডাক্তারবাবুর সহিত দেখা। তিনি সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শচীনবাবু অনিলের পিছনে পিছনে চলিতে লাগিলেন।

অন্ধকার পথে ফিরিতে ফিরিতে শচীনবাবু একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিতেছিলেন।

*

বাসায় ফিরিয়া শুনিলেন অঞ্জলি অনেকক্ষণ যাবৎ অপেক্ষা করিতেছিল, সবেমাত্র গেল।

মীরা প্রশ্ন করিল, কোথায় গিয়েছিলে ?

শচীনবাবু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলেন, তিনি আজিকার নূতন অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সমস্ত কথাই বলিয়া ফেলিলেন। পরিশেষে সাবধান করিয়া দিলেন,—এসব প্রকাশ হলে গুরুতর বিপদ হবে।

মীরা সেকথা গ্রাহ্য না করিয়া কহিল, বৌটা তোমাকে চা দিলে ? অমন করে কথা বললে ?

—হ্যাঁ।

—ও ডাক্তারবাবুর বেটার বৌ, ম্যাট্রিক পাস। কিন্তু কেমন করে পারলে ?

শচীনবাবু কহিলেন, সম্ভবতঃ সে জানে যারা দেশের কাজ করে তারা

একই জাতের, তাই তাদের সে ভালবাসে, তাদের নিকট লজ্জা করা অনাবশ্যক বলে মনে করে।

মীরা চিন্তান্বিত হইল—সে কি যেন ভাবিতেছিল।

শচীনবাবু কহিলেন, আজ বুঝলাম, বিপ্লবী এই পরিচয়টুকু পেলেই এরা পরকে আপনার করে নেয়। তখন এদের সহানুভূতি এবং সাহায্য পাওয়ার পথে আর কোন বাধা থাকে না।

মীরা কহিল, তোমাকে যদি গ্রেপ্তার করে আমি কি করব?

—বহু স্ত্রীর স্বামী গ্রেপ্তার হয়েছে, মরে গেছে—কিন্তু দেশের মুক্তি-সংগ্রাম থামে নি।

মীরা কহিল, আমি ভয় করি না, কিন্তু খোকা যে কি করবে?

মীরার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল।

*

শচীনবাবুর সামর্থ্য ছিল না ত্রিশ টাকা দিবার—

পরদিন দ্বিপ্রহরে গার্ল স্কুলে গিয়া শুনিলেন অণিমা অসুস্থ, স্কুলে আসেন নাই। শচীনবাবু দপ্তরীর মারফত একখানি চিঠি পাঠাইয়া টাকা দিবার অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীমতী রায় তখন অত্যন্ত অসুস্থ, ঘন ঘন বমি হইতেছে, শচীনবাবুর পত্র পাইয়া কি করিবেন বুঝিতে পারিলেন না। জ্বরের ঘোরে শুধু মনে হইল টাকাটা দিতে হইবে। কয়েকটি মেয়ে শুশ্রূষা করিতেছিল, তাহাদিগকে বাহিরে যাইতে বলিয়া বহু কষ্টে উঠিয়া টাকাটা বাহির করিয়া খামে ভরিয়া দপ্তরীকে ডাকাইলেন। দপ্তরী শচীনবাবুকে টাকাটা পৌছাইয়া দিল।

শচীনবাবু মনে মনে শ্রীমতী রায়ের কর্ত্তব্যপরায়ণতার প্রশংসা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলেন।

বৈকালে মাঠের মাঝখানে বসিয়া আড্ডা দিতে দিতে রমণীবাবু কহিলেন, শচীনবাবু, আপনারই ভাগ্য।

—অর্থাৎ !

—বদনামের খোশখবরও ভাল।

সুরেনবাবু টিপ্পনী করিলেন,—মিথ্যা হোক, সত্য হোক, অমন কথা আমাকে বললে ত আমি গর্ব্ব বোধ করতাম।

সংক্ষেপে ব্যাপারটা এই যে, শ্রীমতী রায় ও শচীনবাবুর এই ঘনিষ্ঠতাকে কেহ কেহ প্রণয়ঘটিত ব্যাপার বলিয়া অপবাদ রটাইতেছে।

শচীনবাবু বলিলেন, সকলের সব কথায় কি কান দিলে চলে হরেনবাবু ?

হরেনবাবু কহিলেন, কিন্তু তারা ছাত্র যে।

—জানি। যে কয়েকটি নাম সত্য গত রাত্রে বলিয়াছিল সেই কয়টি নাম উচ্চারণ করিয়া শচীনবাবু কহিলেন, এরা বলছে ত ?

সুরেশবাবু স্বীকার করিলেন।

শচীনবাবু কহিলেন, আরও অনেক কিছু শুনতে পাবেন ওদের মুখ থেকে, অপেক্ষা করুন। ওদের পক্ষে ওটা দরকার—

অদূরে অন্ধকারে কে যেন পায়চারি করিতেছিল, শচীনবাবু একটা অজুহাতে উঠিয়া যাইয়া দেখিলেন—অনিল। টাকাটা দিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

*

যথাসময়ে স্কুল খুলিয়া গেল।

শচীনবাবু মনে মনে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলেন। কতকগুলি নিরপরাধ যুবক অনর্থক আত্মাহুতি দিয়াছে মাত্র। অশেষ কষ্ট সহ্য করিতে করিতে তাহাদের হয়ত কেহ ফিরিবে, কেহ হয়ত ফিরিবে না। শহরের জীবনযাত্রা, খাওয়া-পরা, রুজি-রোজগার সব এমনি অব্যাহতভাবে

চলিযাছে যে, এখানে গুরুতর ব্যাপার কিছু ঘটিয়াছে এমনও মনে হয় না। সত্যদের রক্তরঞ্জিত পথে মানুষ চলিয়াছে উদাসীন পদক্ষেপে। তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে—কয়েকটি প্রাণীর বক্ষরক্ত সিঞ্চিত পৃথিবীর মাটিকে। সাধাবণ প্রাণে তাহা যেন সাড়া জাগায় নাই।

স্কুল হইতে ফিবিয়া শচীনবাবু বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতেছিলেন। মনেব ভিতরে একটা নিষ্ফলতার অভিমান পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছিল, একটা কিছু করা প্রয়োজন। ওদের প্রজ্বলিত বহ্নিকে যেমন কবিয়াই হোক জীযাইয়া রাখিতে হইবে। মাতৃপূজাব এ হোমশিখাকে অনির্ব্বাণ রাখিতেই হইবে তাহাতে যত প্রাণেব ঘৃতাহুতিই লাগুক।

গীতা আসিল—অত্যন্ত ম্লানমুখে।

শচীনবাবু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই গীতা ব'লিল, কি হবে স্যাব।

—তাই ভাবছি।

—আর ত কেউ নেই।

—কেন, কেন? তোমরা আছ, আমি আছি—

—কিন্তু কি করা যায়?

—কাল আমাদেব স্কুলে হরতালেব কথা হচ্ছে,হযত সফল হবে না। কাবণ ওই দুই পার্টির ছেলেবা আসবেই। তবে গার্ল স্কুলটায় হযত হতে পাবে।

—তবে তাই। শ্যামলীবা জন আষ্টেক আছে তারাই গেটে যাবে।

—আপনাদের স্কুলে ধলাবা কত জন আছে?

—জানি না, কে কোন্ দলে তা আব বুঝবাব যো নেই, তবে তাবা জন কুড়ি হবেই বৈ কি?

গীতা কহিল, তবে তাই হোক। গীতা চলিয়া গেল একটা অনিশ্চয়তা লইয়া।

শচীনবাবুর পুত্র একটা জাতীয় পতাকা হাতে করিয়া আসিয়া কহিল, বাবা, বন্দে মাতলম্—

—ও দিযে কি করবি ?

খোকা যাহা জানাইল তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সে বড় হইয়া সত্যদার মত বিরাট শোভাযাত্রা লইয়া বাহির হইবে। তাহার কাছে এটা একটা খুব মজার ব্যাপার।

শচীনবাবু কহিলেন, তা বেশ।

ধলা আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, আমায় ডেকেছেন স্যার ?

—কে বললে ?

-গীতাদি বললেন।

হ্যাঁ, কাল তোমরা কয় জন পিকেট করতে যাচ্ছ ?

-জন কুড়ি।

—লাঠি চার্জ্জ হবে জান ?

— ধলা একটু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, জানি।

--তোমাদের যদি কিছু হয় !

-যদি আপনার অনুমতি পাই তবে স্যার, সকলেই মরতে প্রস্তুত।

শচীনবাবু ধলার মুখের পানে চাহিলেন। ছেলেটা অঙ্ক পারে না বলিয়া কতদিন তিনি তিরস্কার করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই তাহার চেতনা হয় নাই--সেই ধলার মুখে আজ অপূর্ব্ব একটা দীপ্তি। মনে মনে তিনি ধলাকে আশির্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন।

*

সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—চারি পাশে সূচিভেদ্য অন্ধকার, আকাশটা যেন মাঝে মাঝে চিড় খাইয়া ফাটিয়া যাইতেছে। আর বাতাসের গর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে ··

মীরা শচীনবাবুর ভাবান্তর লক্ষ্য করিতেছিল। সে প্রশ্ন করিল, তুমি অমন গম্ভীর কেন ? কি হয়েছে বল ?

—হ্যাঁ, আজ বলব। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক আজ সত্যদের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। যে-কোন দিন আমাকে ধরে নিয়ে যেতে পারে, তার জন্যে তুমি প্রস্তুত থেকো—

মীরা নির্ব্বাক হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে সে বলিল, আমি কেমন করে থাকব?

—হৃষীকেশ পাঠকের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া শচীনবাবু বলিলেন, ভগবান তোমায় রক্ষা করবেন।

মীরা নির্ব্বাক।

—তোমার ভয় করে?

—না, সত্যদের মত ছেলেছোকরারা যদি জেলে যেতে পারে তবে তুমিও না হয় গেলে, কিন্তু খোকাকে নিয়ে আমি সংসার চালাবো কি করে?

—তুমি ভেবো না—যেমন করেই হোক সংসার চলবে।

মীরা চুপ করিয়া রহিল। শচীনবাবু লক্ষ্য করিলেন, ভীতা ত্রস্তা মীরার হৃদয়েও এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার সঙ্কল্প যেন দেখা গিয়াছে। তাহার তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তির পানে তাকাইয়া শচীনবাবু মুগ্ধ হইলেন।

মীরা শুইয়া পড়িল, শচীনবাবুও শুইলেন, কিন্তু ঘুম আসিল না। কতকগুলি ছেলেমেয়েকে এমনি করিয়া বিপদের মুখে পাঠাইয়া কি তিনি ভাল করিয়াছেন? যদি কেহ কাল গুরুতররূপে আহত হইয়া মারা যায়! ভাবিতে ভাবিতে মাথাটা যেন কেমন গরম হইয়া উঠিল, শিয়রের জানালাটা খুলিয়া দিয়া দেখিলেন বর্ষণ কমিয়াছে, কিন্তু বাতাস রহিয়া রহিয়া প্রবল বেগেই বহিতেছে।

বিছানায় শুইয়া তিনি জাগিয়াই ছিলেন, জানালায় মৃদু আওয়াজ হইল। একটা বিড়াল নিত্যই এই সময় দুধ খাইবার প্রলোভনে আসে।

তিনি ফিরিয়া দেখিলেন না · দূরের কোনও একটা ঘড়িতে একটা বাজিল। বাতাসে মশারিটা উড়িতেছে, কিন্তু না—কে যেন টানিতেছে—

শচীনবাবু মশারি হইতে মুখ বাহির করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে তাকাইলেন, আকাশ ঘনান্ধকারে অবলুপ্ত, একটু বিজলী খেলিয়া গেল, তাহাতে স্পষ্টই মনে হইল কে যেন জানালায় দাঁড়াইয়া। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কে ?

—দরজা খুলুন।

শচীনবাবু যন্ত্রচালিতের মত দরজা খুলিলেন। আলো জ্বালাইতে দেশলাই ধরাইয়াছেন অকস্মাৎ ফুঁ দিয়া নিভাইয়া দিয়া অদৃশ্য আগন্তুক কহিল, আমি অঞ্জলি, পিছনে লোক আছে।

-কি ?

দু'টিন পেট্রোল এনেছি। নগেনদের বাড়ী পুলিস ঘেরাও করেছে। আপনার এখানে ছাড়া উপায় নেই। বহু কষ্টে বের করে এনেছি। আপনি যেখানে হয় রাখুন, আসি—

—তুমি—

— আমি চলে যাব—

আচমকা অঞ্জলি বাহিরের সূচীভেদ্য অন্ধকারে মিশিয়া গেল। শচীনবাবু হাতড়াইয়া দেখিলেন তাঁহার পায়ের কাছে দুইটি পেট্রোলের টিন রহিয়াছে, কিন্তু পেট্রোলের গন্ধটা তেমন উগ্র নয়। তিনি সে দুইটিকে চালের হাঁড়ির পিছনে রাখিয়া ডাক দিলেন, মীরা !

মীরা ঘুমাইতেছে, সে জবাব দিল না। শচীনবাবু আবার শুইয়া পড়িলেন।

*

পরদিন যথাসময়ে শচীনবাবু স্কুলে রওনা হইলেন। পথে দেখিলেন শ্যামলীরা গেটে পিকেটিং আরম্ভ করিয়াছে, অদূরে একদল পুলিস

দাঁড়াইয়া আছে। স্কুলে ঢুকিবার পথে ধলারা কয়েকজন দাঁড়াইয়া। শিক্ষকদের তাহারা বাধা দিল না।

তিনি স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। পিছনে একটা হৈ চৈ আরম্ভ হইল। ফিরিয়া দেখেন যে ছেলেগুলি তাঁহাকে আর শ্রীমতী রায়কে জড়াইয়া অশোভন একটা অপবাদ রটনা করিতেছে, তাহাদেব নেতৃত্বে কতকগুলি ছেলে স্কুলে প্রবেশ করিতে উদ্যত, কিন্তু ধলারা গেটে শুইয়া পড়িয়াছে।

মুহূর্ত্তে কি হইল, ধারণা করা যায় না। দেখা গেল, অপেক্ষমাণ পুলিসবাহিনী লাঠি চালাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিয়া দিয়াছে এবং ছেলেরা বিজয়োল্লাসে স্কুল-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়াছে। কতকগুলি ছেলে বাহিরে ছিল তাহারা পুলিসবাহিনীকে তিরস্কাব করিতেছে—ভিতর হইতেও কতকগুলি ছাত্র তাহাদিগকে গালাগালি দিতেছে।

পুলিস-দল ক্রুদ্ধ হইয়া স্কুল-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল এবং নির্ব্বিচাবে লাঠি চালনা করিয়া চলিয়া গেল। সময় দু' এক মিনিট, কিন্তু এরই মধ্যে ত্রিশ জনেরও অধিক ছাত্র ধরাশায়ী হইয়া পড়িয়াছে। পুলিসেব লোকেরা এম্নি ভাব দেখাইয়া বিজয়গর্ব্বে চলিয়া গেল যেন যুদ্ধে জিতিয়াছে।

বাহিরে আহত সত্যাগ্রহিগণ একে একে সকলেই উঠিয়াছে, শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া হাঁকিতেছে, বন্দেমাতরম্।

ধলাকে উহারা ধরিয়া দাঁড় করাইয়াছে, তাহার মাথা ও কনুই হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে।

ধলা ক্ষীণকণ্ঠে হাঁকিতেছে—'বন্দেমাতরম্'—আর খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে চলিতেছে···

আর সবাই চলিয়াছে তাহাদের অনুসরণ করিয়া। ভয়হারী মন্ত্রে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া।

শচীনবাবু দাঁড়াইয়া থাকিতেই এতগুলি ব্যাপার দ্রুতগতিতে তাঁহার চোখের সামনে ঘটিয়া গেল। তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া আপিস-কক্ষে গেলেন—তাঁহার পাশের ঘরে হাই-বেঞ্চের উপর জন পঞ্চাশ ছেলে শুইয়া যন্ত্রণায় কাতরাইতেছে, দুই জন ডাক্তার আসিয়াছেন, তাঁহারা ক্ষত পরীক্ষা করিতেছেন। দুই-চারজন অভিভাবক উকিল মোক্তারও আসিয়াছেন। হেডমাষ্টার বিপন্নভাবে নিজের ঘরে বসিয়া আছেন, দেহ যেন তাঁহার অবশ হইয়া আসিয়াছে।

শচীনবাবু ফিরিয়া দেখেন, পুলিস সাহেব স্বয়ং বহু পুলিস লইয়া গেটের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন। শচীনবাবু দ্রুত গেট বন্ধ করিয়া দিয়া সামনের দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস সাহেব দরজা খুলিতে হুকুম দিলেন।

শচীনবাবু বজ্রকণ্ঠে কহিলেন, হেডমাষ্টারের অনুমতি ছাড়া আপনারা ভেতরে ঢুকতে পারবেন না।

উকীল মোক্তার দুই-চার জন আসিয়া দাঁড়াইল। উভয় পক্ষে বচসা সুরু হইল—আইনের তর্ক, ঢুকিবার অধিকার আছে কি না তা লইয়া।

শচীনবাবু লক্ষ্য করিলেন, যে কনেষ্টবলটি "নোকরী ছোড় দেগা" বলিয়া একদিন অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল সেও এক প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া আসিয়াছে, কিন্তু অত্যন্ত বিমর্ষ ম্লান মুখে এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। শচীনবাবুর সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইতেই সে যেন লজ্জা পাইয়াছে এমনি ভাবে আর একজনের আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল।

বাদানুবাদের পর স্থির হইল, পুলিস সাহেব ভিতরে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিবেন। পুলিসবাহিনী বাহিরে থাকিবে।

তাহাই হইল।

*

শচীনবাবু শ্যামলীদের সংবাদেব জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি ফিরিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। পিছনের গেট দিয়া তিনি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া পড়িলেন, পথে ধলাদের একজন জানাইল যে, লাঠিচার্জ্জ হইলেও কেহ বিশেষ আহত হয় নাই। আর একটু অগ্রসব হইলে গার্ল স্কুলের দপ্তরী তাহাকে বলিল, দিদিমণি ডাকছেন।

শচীনবাবু গার্ল স্কুলে ঢুকিয়া পড়িলেন। দপ্তরী তাঁহাকে সঙ্গে করিযা অণিমা রায়ের বাসায় লইয়া গেলেন।

শ্রীমতী রায় নীরবে বসিয়া বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। শচীনবাবুকে দেখিয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিলেন, আমার স্কুলের মেয়েদের এমনি করে মারবে আর আমি নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে বসে দেখব—এ আমি পারব না, আমি আজই কলকাতা চলে যাব।

শচীনবাবু অবাক হইলেন। মিস রায়ের এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, আপনার এ ধরণের দুর্ব্বলতা শোভা পায় না মিস রায়।

—কেন ?

—কান্না আর আর্ত্তনাদ সাধাবণ মেয়েদের মানায়, আপনাব মত উচ্চশিক্ষিতাকে নয়।

অণিমা রায় বিস্মিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শচীনবাবু বলিলেন, "আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে।"

শ্রীমতী রায় বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, কাব্য করবার আর সময় পেলেন না ?

—সে যাই হোক, কলকাতা আপনার যাওয়া হবে না। এখানেই

থাকতে হবে। এখনও অনেক কাজ বাকী—কথাটা আদেশের মতই শুনাইল।

শচীনবাবু চলিয়া আসিলেন।

*

মীরা চাউল বাহির করিতে যাইয়া দেখে সেখানে দুইটি টিন—পেট্রোল। তাহার সামনে সমস্ত যেন মসীলিপ্ত হইয়া গেল। মীরা আর্ত্তকণ্ঠে ডাকিল,—খোকা, খোকা।

খোকা নিকটেই ছিল, তাহাকে বুকে করিয়া মীরা কাঁদিয়া উঠিল। খোকা কহিল, কাঁদছ কেন মা?

—তোর বাবা আমাদের ফেলে চলে যাবে। আমরা কি করবো?

—আমি আর তুমি থাকব—

—কোথায়? কেমন করে বাবা!

—আমি বন্দে মাতরম্ নিয়ে খেলা করবো, তুমি কাজ করবে।

মীরা কাঁদিতেছিল। শচীনবাবু বিষণ্ণভাবে প্রবেশ করিলেন। মীরা প্রশ্ন করিল, কত কি ঘরে এনে জমা করছ, কি হবে?

শচীনবাবু কহিলেন, যা হবার তাই হবে। তুমি ভেবো না।

—খোকার কি হবে?

—তোমার খোকার মতই আদরের দুলাল সত্য, ধলা, অঞ্জলি—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। ভগবানই তাকে রক্ষা করবেন।

মীরা সান্ত্বনা পাইল না, সে কাঁদিতে কাঁদিতে রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

*

মিঃ সেনের বাড়ীতে সাহিত্য-সমিতির দুইটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তাহার জন্যই বোধ হয় মিঃ সেনের সহিত শচীনবাবুর একটু ঘনিষ্ঠতা

হইয়াছিল। দুই-এক জন অফিসার পর্য্যন্ত শচীনবাবুকে ঠাট্টা করিয়াছেন—মিঃ সেনের বাড়ীতে চায়ের আসরে বসবার সৌভাগ্য যখন আপনার হয় তখন আর চাই কি ?

নিজের বাড়ীর সামনে শচীনবাবুর সহিত দেখা হওয়ায় মিঃ সেন শচীনবাবুকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিষয়ে আলোচনা চলিল। সেন সাহেব এমনি আলোচনা মাঝে মাঝে না করিতেন এমন নয়। আজ আলোচনা কিছু দীর্ঘ। যথাসময়ে চা বিস্কুটও আসিল। মিঃ সেনের বাড়ীতে কেহ চা বিস্কুট পায় না, এমনি একটা বদনাম শহরে চলতি ছিল কিন্তু শচীনবাবু লক্ষ্য করিয়াছেন ঐ দু'টি দ্রব্যের তাঁহার কোনদিন অসদ্ভাব হয় নাই—এমন কি চাকর না থাকিলেও দু'খানি সোনার চুড়ি মোড়া হাত পর্দ্দার আড়াল হইতে চা প্রভৃতি দিয়া যায়। সেন সাহেব শ্রীমতী রায়কে লইয়া একটু ব্যঙ্গও করিলেন। শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, যদিও মিথ্যা তবুও এই অপবাদকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করিয়াছেন।

*

সন্ধ্যার প্রাক্কালে রিজিয়াকে পড়াইবার জন্য শচীনবাবু বাহির হইলেন। রিজিয়া আলো লইয়া পড়িবার ঘরে বসিয়াই ছিল। অভিবাদন করিয়া কহিল, স্যার, আসুন—ভাল আছেন ?

শচীনবাবু বলিলেন, ভাল বৈ কি ?

—ওরা সব ভাল ?

কাহারা তাহা শচীনবাবু জানিতেন, তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ, বাড়ীতে সব ভালই।

রিজিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। কহিল, আঁক কষতে দিন স্যার। শচীনবাবু জটিল একটা অঙ্ক বাছিয়া দিয়া বসিয়া রহিলেন। রিজিয়া

অঙ্ক কষিতে কষিতে হঠাৎ উঠিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণকাল পরে চা লইয়া আসিয়া বলিল, চা খেয়ে নিন্ স্যার।

শচীনবাবু চা পান করিতে আরম্ভ করিলেন। রিজিয়া বলিল, আই বি থেকে খবর দিয়েছে, বাবা বলছিলেন, আপনি নাকি সব হাঙ্গামার গোড়ায় আছেন।

—ভাল কথা!

—আপনার বাসা সার্চ্চ হবে, টিনগুলো আমার এখানে দিয়ে যাবেন। শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, তুমি—

রিজিয়া একটু হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ।

— কি করে?

রিজিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া চুপ করিয়া গেল এবং আপন মনেই খাতায় কি লিখিতে লাগিল।

ক্ষণিক পরে খাতাটা দিয়া কহিল, করেক্ট্ করে দিন স্যার।

শচীনবাবু পড়িলেন,—"রাত্রি ঠিক এগারোটায় আমাদের বাসার পশ্চিমে খালের ধারে রাখিয়া গেলে আমি তুলিয়া রাখিয়া দিব এবং প্রয়োজন হইলেই ফিরাইয়া দিব। আজ হইলেই ভাল হয়। বাবা মফঃস্বলে যাইবেন রাত্রি নটায়।"

শচীনবাবু "ইয়েস" লিখিয়া দিলেন। রিজিয়া খাতার পাতাটা পেন্সিলে কাটিয়া-কুটিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরিতে উদ্যত হইলেন, তখন সাড়ে আটটা হইবে, সময়মাত্র আড়াই ঘণ্টা, ইহার মধ্যে কিরূপে টিন দুইটি পাঠানো যায় তাহা ভাবিতে ভাবিতে একটু বিপন্নই বোধ করিলেন। সদর রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া সম্ভব নয়, পুলিস ছাড়া বহু বেতনভোগী এবং অবৈতনিক সংবাদদাতা সতত বিচরণশীল। রিজিয়াদের বাসার পিছন দিক দিয়া যে খালটা গিয়াছে তাহা দিয়া মাঝে মাঝে নৌকা যায় এই মাত্র।

পথে একটি মেয়ে তাঁহাকে প্রণাম কবিল—মুখখানি পবিচিত, নাম জানা নাই। মেয়েটি মৃদুকণ্ঠে কহিল, শ্যামলী ভাল আছে, আপনি ব্যস্ত হবেন না।

—ও হ্যাঁ! খবরটা তোমাদের দিদিমণিকে দিযে এস। তিনি বড্ড ব্যস্ত বাগীশ।

—তাঁকে দিয়েছি, তিনি আপনাকে বলতে বললেন—

—তুমি অঞ্জলিকে একটু খবর দিতে পাব?

—দিচ্ছি।

শচীনবাবু বাসায় আসিয়া পৌছিবার সঙ্গে সঙ্গেই অঞ্জলি আসিযা হাজির। শচীনবাবু বলিলেন, তোমাদেব টিন দিয়ে কি হবে?

অঞ্জলি বলিল, প্রথম পুলিস ব্যারাক পোড়ানো, দ্বিতীয় পোষ্টাপিস।

—বিজিয়া বলিল, আমাব এখানে নাকি সার্চ্চ হবে।

অঞ্জলি বিস্মযে বলিল, তবে এক্ষুনি সবাতে হয।

—কিন্তু কোথায?

অঞ্জলি বিমূঢভাবে চাহিয়া রহিল। শচীনবাবু বলিলেন, বিজিযা বলেছে তার ওখানে রাখতে—১১টাব সময়।

—তা হব। কিন্তু কে নেবে এখন?

—ধলারা কেউ।

—আচ্ছা আমি খবর দিযে যাচ্ছি।

মীরা খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছিল। খোকা ঘুমাইয়াছে। মীবা বলিল, তুমি ত জেলে যাবেই, আজ হোক, কাল হোক। আমি কি করব?

—তুমি কি ভাবছ?

—আমিও তোমাদের কাজ করব, তুমি জেলে গেলে আমি বসে থাকব না কিছুতেই।

—খোকা?

—তোমাদের কেউ নিশ্চয়ই রাখবে কাছে।

—তোমার এ সাহস কোথা থেকে হ'ল ?

—এমনি ভাবে মেয়েদেরও যখন মেরেছে তখন এর প্রতিবিধান করতে হবেই।

শচীনবাবু হাসিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই ধলা আসিয়া উপস্থিত হইল। সে জানাইল এ সামান্ত কাজ সে অনায়াসেই কবিতে পারিবে, নৌকা ভাড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ পথে নৌকায যাইতে যাইতে বাখিয়া যাইবে। আব একটি সংবাদ, তাহাদের নামেও নাকি অবিলম্বে ওয়ারেণ্ট বাহির হইবে।

ধলা বলিল, তবে কি ফেবার হব ?

—তোমরা সকলেই ফেরার হলে চলবে কেন ? সে পরে দেখা যাবে।

কযেকদিন চলিযা গেল।

ধলা জিনিষগুলি যথাস্থানে পৌছাইয়া দিয়াছে। রিজিয়া উপস্থিত ছিল। সে কাঁকালে করিয়া ঘরে লইয়া গিয়াছে।

স্কুল আবার বন্ধ হইয়াছে দিন দশেকের জন্য। আপততঃ কোন কাজ নাই। বাহিবে একটি থানায় একটা শোভাযাত্রা বাহির করিবার তোড়-জোড চলিতেছে। ধলারা কযেকজন এবং অন্যান্য স্কুলের কতিপয় ছাত্র যাইবে স্থির হইয়াছে, কিন্তু কবে তাহাব স্থিবতা নাই। স্থানীয় লোকে খবব দিবে, যখন সশস্ত্র পুলিসবাহিনী স্থানান্তরিত হইবে তখন যাইতে হইবে—শোভাযাত্রা বাহির করিবার প্রকৃষ্ট সময় তাহাই।

এদিকে অর্থাভাব। সত্যরা টাকার অভাবে কষ্ট পাইতেছে, প্রায়শঃই অনাহারে হাঁটিয়া যাতায়াত করিতে হইতেছে। তাহাদিগকে টাকা সরবরাহ করিবার উপায় নাই। অণিমা রায়ের যথাসর্ব্বস্ব গিয়াছে, যে টাকা এদিক-ওদিক হইতে আসিত তাহাও আসিতেছে না। মাত্র একজন ব্যাপারী সামান্য টাকা দিয়াছেন। ধলারা গেলেও টাকার দরকার,

নৌকা ভাড়া, খাওয়া, ফিরিবার ব্যবস্থা সবই প্রয়োজন। শচীনবাবু তাই কয়েকদিন চিন্তান্বিত আছেন।

ঠিক এমনই সময়ে একদিন রাত্রে পেট্রল পার্টির সহিত টাকা সরববাহ-কারী অনিলের দলের একটা সংঘর্ষ হইয়াছে। তাহাতে দুইজন কন্ষ্টেবল আহত হইয়াছে। সে পাড়ার অনেকেই এখন হাজতে—অনিলও। অনিল সংবাদ যাহা দিয়াছে তাহার সারমর্ম্ম এই যে, সংঘর্ষ এড়াইতে গেলে সত্য, স্বরাজ ও বিভূতি ধরা পড়িয়া যাইত। তাহারা উহাদের সহিতই ছিল এবং মারামারির ফলে পলাইবার সুযোগ পাইয়াছে আর অনিলদের বিচারের ভার মিঃ সেনের হাতে পড়িয়াছে—এক মাসের বেশী জেল হইলে সব পণ্ড হইয়া যাইবে।

শচীনবাবু চিন্তাকুল হইয়া অকারণ ঘুরিতে ঘুরিতে একটা রেস্তোর্ঁায চা খাইতে ঢুকিলেন। মণিবাবু চা খাইতেছিলেন, তাহার পাশে একজন পুলিসের জমাদার। মণিবাবু সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া চা খাওয়াইলেন। শচীনবাবুকে বিষণ্ণ দেখিয়া মণিবাবু বলিলেন, কি? আপনাকে যেন একটু বিমর্ষ মনে হচ্ছে?

—হাঁ।

—কেন?

—অর্থাভাব! মাষ্টারের যা হয়—ইস্কুল বন্ধ, মাইনে পেতে দেরি। ছাত্রেরা নিয়মিতভাবে বেতন দেয় না।

—তা ত বটেই। কতকগুলো ছেলের অপকর্ম্মের দরুন দেশের কত লোক কত কষ্ট পাচ্ছে!

—আপনার ভায়ের মামলার কি হ'ল? সেই ছুরিমারা ব্যাপার!

মণিবাবু একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিলেন, তার আবার কি হবে? খালাস হয়ে যাবে!

—যে ছুরি খেয়েছে, তার ত শুনলাম আড়াই বছর হয়েই গিয়েছে।

—তা ত হবেই। সেটা ত অন্য আইনে—বিপ্লবী হিসেবে—

—আজ্ঞে হাঁ।

শচীনবাবুর বাদানুবাদ কবিবার ইচ্ছা ছিল না, তিনি উঠিলেন, তখন রাত্রি হইয়াছে। অন্ধকাব রাস্তা, একাকীই ফিরিতেছিলেন, পথে একটা কাঠের পুল, জায়গাটা অসমান, তিনি পা টিপিয়া টিপিয়া চলিতেছিলেন। একটু আগে এক পশলা বৃষ্টি হইযাছে, আবাব গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

কে যেন পিছন হইতে ডাকিল,—মাষ্টাব মশায।

পিছন ফিরিলেন, একটি লোক দাঁড়াইযা আছে, কিন্তু সেই অন্ধকারে আবছা দেখা গেলেও কে তাহা বুঝা যাব না। লোকটি তাঁহার কাঁধে হাত দিযা আন্দাজে হাত ধরিল। তিনি একটু বিস্মিত ও ভীত হইলেন,—কে ?

লোকটি তাঁহার হাতে একখানা খাম গুঁজিয়া দিয়া বলিল, আপনাব চিঠি।

দ্বিতীয় বাক্য উচ্চারণ না করিয়া সে চলিয়া গেল। পিছনের লাইট পোষ্টেব আলো বাঁকেব মুখে আসিযা পডিযাছে, কিন্তু অস্পষ্ট। লোকটি দ্রুত চলিযা গেল, মনে হইল যেন কোন পুলিস অফিসার।

শচীনবাবুব মনে সংশয় জাগিল, কিন্তু তবুও নির্লিপ্তভাবে সেটা পকেটে পুরিযা বাসায ফিবিলেন। এতদিন আত্মরক্ষাব একটা ইচ্ছা ও চেষ্টা ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে হাল ছাড়িয়া দিয়া অনিবার্য্য ভবিষ্যতের প্রতীক্ষা করিতেছেন। জানেন, ভাবিযা লাভ নাই। আজ হউক কাল হউক তাহাকে কারাবরণ করিতেই হইবে।

বাসায আসিযা দেখেন খামেব ভিতবে দুইখানা দশ টাকার নোট এবং ছোট একটি চিঠি, নামধামহীন অপরিচিত লেখা—"সাবধান হইবেন, যে-কোন দিন খানাতল্লাস হইতে পারে।" শচীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন, এ কোন্ অজ্ঞাত দাতার দান ও সাবধান-বাণী।

সেদিন বর্ষণ-মুখর দিবস, সকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। শচীনবাবু বাসায়ই বসিয়া ছিলেন, অদূরে গলির মোড়ে পানের দোকানে একটা লোক বসিয়া থাকে নিত্য, নিয়মিত ভাবে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও ছায়াব মত তাঁহাকে অনুসরণ করে, দিনে পঁচিশ বার পঁচিশ জাযগায় তাহাব সহিত দেখা হয়, লোকটি গুপ্ত সংবাদদাতা সন্দেহ নাই—কিন্তু কে? শহবে নবাগত বলিযা অনুমান হয়।

আজ তিনি ভাবিয়া ভাবিয়া বুঝিযাছেন, সত্যর সাহিত্য সমিতির এত কর্ম্মতৎপরতা কেন? তাহাব সহিত বহু সরকারী কর্ম্মচাবীব খাতির থাকাটা আজ একটা মূলধনস্বরূপ হইয়াছে, না হইলে বহুপূর্ব্বেই শৈশবেই এই বিপ্লব-প্রচেষ্টার অকালমৃত্যু ঘটিত।

সারাদিন কোন কাজ ছিল না। বসিয়া বসিয়া দিন কাটিয়াছে, বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইবেন, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই রিম্ ঝিম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়াছে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিযাছে, ঐ লোকটি নির্ব্বিকার চিত্তে পানেব দোকানে বসিয়া পান চিবাইতেছে আব দোক্তার পিক্ ফেলিয়া বৃষ্টিব জলস্রোতকে ন্যক্কারজনক রক্তিমতায় কুৎসিত করিয়া দিতেছে। মিঃ সেনের বেহারা আসিয়া জানাইল, তাঁহাকে মিঃ সেনেব বাড়ীতে একবাব যাইতে হইবে।

শচীনবাবু অনুমান কবিলেন, মেঘমেদুর সন্ধ্যায় মিঃ সেনের বোধ হয় কাব্যপ্রীতি জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই তাঁহার সহিত সন্ধ্যাটা কাব্যালোচনায় কাটাইয়া দিতে চান। শচীনবাবু ঘরে ছটফট করিতেছিলেন, ছাতা লইয়া বেয়ারার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন।

পথে অন্ধকার। মাঝে মাঝে মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে—আলোর স্বল্পতায় পথের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া উঠিয়াছে। শচীনবাবু চলিতেছিলেন, মাঝে মাঝে বৃষ্টির ছাট্ গাযে

আসিয়া লাগিতেছে। বেহারা গেট খুলিয়া তাঁহাকে ভিতরে আসিতে বলিল। শচীনবাবু বিস্মিত হইলেন, বাড়ীর ভিতরে লইয়া যাইতে চাহিতেছে কেন? ভুল করিয়া নয় ত!···হয় ত মিঃ সেন ভিতরেই আছেন।

বেয়ারা শয়নকক্ষের একটা চেয়ারে তাঁহাকে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল।

কেহ কোথাও নাই, কেবলমাত্র শিশুকন্যাটি খাটের উপর নিদ্রিত। ডেপুটিবাবুর বাড়ীর একেবারে অন্দরে একাকী বসিয়া থাকিতে থাকিতে শচীনবাবু বিস্ময়-মিশ্রিত আতঙ্কে ঘামিয়া উঠিলেন। এমন সঙ্কটজনক অবস্থায় তিনি ত পূর্ব্বে কখনও পড়েন নাই।

মিসেস্ সেন একদিন মাত্র সাহিত্য সমিতির উৎসবে মিনিট পাঁচেকের জন্য ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে তেমন আলাপ পরিচয় তো হয় নাই···

ভাবিয়া ভাবিয়া শচীনবাবু কিছুই স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। হঠাৎ মিসেস্ সেন এক প্লেট খাবার ও চা লইয়া আসিয়া টেবিলে রাখিলেন। নমস্কারান্তে অত্যন্ত সহজ সুরে বলিলেন, খেয়ে নিন্।

অবাক বিস্ময়ে শচীনবাবু তাকাইলেন, ব্যাপারটা বিশ্বাস হয় না, অথচ একেবারে চোখের সামনে প্রত্যক্ষ ভাবে মিসেস্ সেন, যিনি কড়া হাকিমকে কড়া শাসনে রাখিয়া সিগারেট কণ্ট্রোল করিয়াছেন বলিয়া শহরে কুখ্যাতি।

শচীনবাবু বিমূঢ়ের মত বসিয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন, সমিতি গড়বার জন্যে এত লম্বা-চওড়া কথা বললেন আর এখন একেবারে চুপ করে আছেন?

শচীনবাবু কোন জবাব না দিয়া একটা সিঙাড়া মুখে পুরিলেন। মিসেস্ সেন একটু হাসিয়া বলিলেন, অবাক হয়েছেন বোধ হয়?

—হাঁ। এ ধরণের ব্যাপার ত নাটক-নভেলেও ঘটতে দেখা যায় না।

—কিন্তু এত অবাক না হয়ে এবার খাওয়াতে মন দিন দেখি।

শচীনবাবু জানিতেন, মিসেস্ সেন বড়লোকের মেয়ে এবং তাঁহার বাবা যে হাতখরচ তাঁহাকে দেন তাই নাকি মিঃ সেনের মাহিনা হইতে বেশী। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, আমাকে কি খাবার জন্যেই ডেকেছেন?

—না। আর একটু কাজও আছে। আপনাকে একটা জিনিষ নিতে হবে। নেবেন ত।

—গ্রহণযোগ্য হলে নিশ্চয়ই নেব।

মিসেস্ সেন আঁচল হইতে দশখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া বলিলেন, এটা আপনি নিয়ে যান।

—আমি! টাকা নিয়ে কি করবো!

—দিলুম—যা হয় করবেন।

শচীনবাবু শঙ্কিত হইলেন। চারি পাশে গুপ্তচরের দল তাঁহাকে উদ্ব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে, শেষে কি ইনিও! বলিলেন, নিতে আমার আপত্তি আছে। প্রথমতঃ, আপনার দান গ্রহণ করবো কেন? দ্বিতীয়তঃ গ্রহণ করলেও কি ইচ্ছামত খরচ করতে পাবো?

—আপনার প্রথম প্রশ্নের জবাব—দরকার আছে বলে করবেন। আর দ্বিতীয়তঃ, যেভাবে খুশী টাকাটা খরচ করবেন। যাই হোক্, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চট্‌পট্ খেয়ে নিন।

শচীনবাবু কহিলেন, আপনার দান গ্রহণ করতে আমি অপারগ।

—কেন? সন্দেহ হচ্ছে? সরকারী টাকা ও নয়, ও আমার হাত-খরচ থেকে দিয়েছি।

—তা' হলেও—আমাকে কেন দেবেন?

—আমার ইচ্ছে।

—অন্যকে ত দেন না

—আপনি কেমন করে জানলেন?

—অন্ততঃ খ্যাতি শুনতাম তা হলে।

—খ্যাতি নেই, বরং কৃপণ বলে বদনাম আছে জানি। কিন্তু ঐ পুলিস আর ম্যাজিষ্ট্রেটদের চা খাওয়াতে আমার ইচ্ছে করে না। কিন্তু আপনাকে খাইয়েছি—

—আমি দরিদ্র হতে পারি কিন্তু অন্যের দান গ্রহণ করতে আমার আত্ম-সম্মানে ঘা লাগে; সেইজন্যেই—

মিসেস্ সেন চট্ করিয়া টাকা কয়েকটা তাহার বুক পকেটে গুঁজিয়া দিয়া বলিলেন, উনি বোধ হয় আসছেন—

সঙ্গে সঙ্গেই কযেকজন লোকেব দূবাগত কলরব কানে আসিল। বোধ হয় মিঃ সেন তাসের আড্ডা হইতে ফিবিতেছেন। মিসেস্ সেন ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, আব ইতস্ততঃ করবেন না টাকা আপনাদেব কাজে লাগাবেন। আমার সঙ্গে আসুন, পেছনেব দরজা দিযে আপনাকে বেরিযে যেতে হবে। নইলে উনি দেখে ফেললে বিপদ হবে।

মিসেস্ সেন তাড়াতাড়ি লণ্ঠন লইযা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন এবং শচীনবাবু যেন অপরাধ করিয়া ধরা পড়িতে যাইতেছেন এমনি একটা উৎকণ্ঠা লইয়া তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। অন্ধকার, পিছল উঠান। মিসেস্ সেন বারান্দায় লণ্ঠনটা বাখিয়া বলিলেন, আসুন—

শচীনবাবু অন্ধকারে মিসেস্ সেনের পিছন পিছন চলিলেন, এক রহস্যময় বোমাঞ্চকর অনুভূতিতে তিনি পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

মিসেস্ সেন পিছনের ক্ষুদ্র দবজাটা খুলিয়া বলিলেন, এ পথের হদিস জানেন ত? একটু এগিযে, পুকুবধাবেব বাস্তা দিয়ে ওদিকে গেলেই গলিতে পড়বেন।

—হ্যাঁ জানি।

তিনি দরজা দিতে যাইতেছিলেন—মিসেস্ সেন যেন একটু চকিত

হইয়া উঠিয়াছেন। ইতিমধ্যে রাস্তার কলরব নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। দূরত্ব সামান্য হাত দুই—অনিলের কথাটা মনে হইল। এক মাসের বেশী জেল হইলে সংসার সব নিবিয়া যাইবে।

কি করিয়াই বা তাঁহাকে ডাকেন! হঠাৎ এক ঝলক বাতাসে মিসেস্ সেনের আঁচলটা শচীনবাবুর একেবারে হাতের কাছে আনিয়া দিল। তিনি তাড়াতাড়িতে তাহাই ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিলেন,

শুনুন।

—বলুন তাড়াতাড়ি।

—অনিলের কেস্‌টা মিঃ সেনের হাতে আছে, দেখবেন যেন এক মাসের বেশী না হয়।

—সে ত আমার হাত নয়, যাঁর হাতে তিনিই ত আপনার হাতের মুঠোয়।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

নিবিড় অন্ধকার। লণ্ঠনের ক্ষীণ আলোক-রশ্মি অবরুদ্ধ দরজার অন্তরালে বন্দী হইয়া গিয়াছে। শচীনবাবু একটু একটু করিয়া পা বাড়াইয়া পুকুরপাড়ে আসিলেন—হঠাৎ কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে কি ভাবিবে এই আশঙ্কায় একবার এদিক ওদিক চাহিলেন, তাহার পর আর একটু ভাবিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। রাস্তাটা জনশূন্য—যাহারা যাইতেছিল, তাহারা মিঃ সেনের দল নহে।

শচীনবাবু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া চলিলেন।

*

বাড়ীতে আসিয়া শচীনবাবুর অন্তর আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল, টাকা পাইয়াছেন, আপাততঃ সত্যদের দুর্গতি দু'চার দিনের জন্য কমিবে। তার উপর এই অভাবিতপূর্ব্ব সহানুভূতিতে তাঁহার অন্তরে একটা আশা জাগিয়াছিল, সত্যদের বুকের রক্ত মাটিকে রাঙাইয়া দিয়াছে—সেই মাটির

বসে যারা পুষ্ট তারা আজ কাঁদিতেছে অজ্ঞাত বীরপুরুষের জন্যে। তাহাদের ত্যাগের প্রভাব ছড়াইতেছে দিকে দিকে। মানুষের অন্তরকে প্রেরণায় রাঙাইয়া তুলিতেছে—হয়ত এসব নিরর্থক নয়, হয়ত সত্যদের দুঃখবরণ সার্থক হইবে, হয়ত দেশ স্বাধীন হইবে। স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে—সেখানে দুঃখকষ্ট থাকিবে না, শ্রমের বিনিময়ে উপযুক্ত অর্থ ও আহার্য্য মিলিবে। শাসকদের অত্যাচারে ও অবিচারে শত শত প্রাণ নষ্ট হইবে না, ন্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা মানুষের জীবন যাত্রাকে সুস্থ করিয়া তুলিবে।

মীরা যখন তাঁহাকে প্রশ্ন করিল—শচীনবাবু তখন আর গোপন করিতে পারিলেন না, সব কিছুই সবিস্তারে বলিয়া ফেলিলেন। মীরা সবিস্ময়ে কহিল, তা হলে হয়ত সত্যদের জয় হবে, না গো? ওরাও যখন রয়েছে—

—হ্যা, হয়ত ভাই—

বহুদিন পরে আজ মীরা ও শচীনবাবু অনেক গল্প-গাছা করিলেন। যেন একটা রঙীন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পাইয়াছেন অনুদার পৃথিবীতে যেন একটু নিরাপদ আশ্রয় মিলিয়াছে।

অনেক রাত্রে তাহারা শয়ন করিলেন। বর্ষণক্লান্ত শীতল রাত্রি। জানালা দিয়া ভিজা বাতাস আসিয়া মশারি দোলাইতেছে। তাহারা ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি দু'টার পরে অকস্মাৎ শচীনবাবু যেন অনুভব করিলেন, কে তাঁহার মাথায় ভিজা হাত দিয়া স্পর্শ করিয়াছে। বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। মীরা ঘুমাইতেছে। তিনি মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, কে?

—দরজা খুলুন স্যার নারীকণ্ঠ।

শচীনবাবু দরজা খুলিলেন। অন্ধকারে কে যেন ঘরে ঢুকিল। তিনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইতে যাইতেছিলেন, আগন্তুক কহিল, জ্বালাবেন না স্যার। আমি শ্যামলী।

—ওঃ, কি খবর বল ত !

—ধলাদারা যাচ্ছে স্যার কাল, সেখানে শোভাযাত্রা হবে। আরও জন পনের আছে। টাকা অন্ততঃ এক শ' চাই, নৌকা ভাড়া হয়েছে তিরিশ টাকা—দুখানা নৌকো।

—তুমি কি করবে ?

—ওরা সব নদীর ঘাটে বসে আছে, আমি টাকা নিয়ে গেলে তবে রওনা হবে !

—তুমি পারবে ? এগিয়ে দেব !

—না—না। আপনি কখ্খনও আসবেন না। এখনও পুলিস আছে মোড়ে। আমি এমন পথে যাবো আপনি তা চিনবেন না।

—পারবে একা !

—হ্যাঁ, একা এলাম, আর যেতে পারবো না। আরতি আছে মোড়ে দাঁড়িয়ে।

—ও আচ্ছা।

শচীনবাবু অন্ধকারে টাকা গুণিতে গুণিতে বলিলেন, কিন্তু একশত হয় না। আশি নিয়ে যাও। তিনি সত্যদের জন্য কিছু সঞ্চয় করিলেন।

—তাই দিন'।

শ্যামলী হাত পাতিয়া টাকা লইয়া বলিল, স্যার আপনি সাবধান থাকবেন, আপনার নামে ওরা খুব লাগিয়েছে, কিন্তু প্রমাণাভাবে আপনাকে ধরতে পারছে না। জানেন, এস্-ডি-ও আপনার ওয়ারেণ্টে সই করেন নি—আপনি সাহিত্যিক, তাই বিশ্বাস করেন নি যে আপনি এসব হাঙ্গামার মধ্যে আছেন।

শ্যামলী অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু দরজায় দাঁড়াইয়া দেখিলেন, কালো একটা অশরীরী মূর্ত্তির মত শ্যামলী বড় রাস্তায় উঠিয়া ওপারের একটা ক্ষুদ্র গলিতে ঢুকিল। অপরিসীম সাহস এই মেয়েটির !

এই অন্ধকারে এমনি করিয়া ও যেন কি এক দুরন্ত আশা বুকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শ্যামলীর অপস্রিয়মান ছায়ার দিকে চাহিয়া শচীনবাবু মনে মনে বলিলেন, তোমাদের ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন যেন সফল হয়। স্বাধীন ভারতে তোমরা পুরস্কৃত হইবে, দেশের দুঃখ মোচন হইবে।

*

পরের দিনটা অত্যন্ত অস্বস্তিতে কাটিতেছিল।

থানার সামনেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ফাঁক পাইলে তাহাতে আগুনও দেওয়া হইবে। যদি গুলি চলে তবে ধলাদের দুই-এক জন নিশ্চয় মারা যাইবে। অবশ্য মরিতে তাহাদের ভয় নাই, কিন্তু শচীনবাবু তাহাদের জন্য একটা দারুণ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতেছিলেন।

বাকী চল্লিশ টাকা সভ্যদের পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহারা এখন কোনও একটা গ্রামের লোকেদের বৈপ্লবিক কর্ম্মে প্ররোচিত করিতে লাগিয়া গিয়াছে।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে মনটা এত বিষণ্ণ হইয়া উঠিল যে, শচীনবাবু আর গৃহে থাকিতে পারিলেন না। একাকী বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক দিন শ্রীমতী অণিমার সহিত দেখা হয় নাই, একবার গেলে হয়।

পথে জনৈক দোকানদার সাদরে ডাকিয়া বসাইল,—আসুন মাষ্টার-মশাই বসুন, একটু চা খান।

ইহার তাৎপর্য্য তিনি বুঝেন নাই, তবে ইদানীং আশ্চর্য্য ও রহস্যময় অনেক ব্যাপারই ঘটিতেছে তাই তিনি বসিলেন। বলা যায় না—কোন সংবাদ হয়ত বা পাওয়া যাইতেও পারে।

দোকানদার বলিল, খবর শুনেছেন বোধ হয়—দারোগা খুন হয়ে গেছে। ছেলেদের উপর লাঠি চালাতে তারাও পাল্টা জবাব দিয়েছিল, তাই মরেছে।

শচীনবাবু শুনিলেন এবং ইহার ভয়াবহ পরিণাম কল্পনা করিয়া মনে মনে শিহরিয়া উঠিলেন। ওখানে চলিবে এখন পুলিসের উস্কানিতে সম্প্রদায়বিশেষের গুণ্ডামি, লুঠতরাজ, বেপরোয়া মারপিট এবং নারী-ধর্ষণ—লাঞ্ছনায় অপমানে পীড়নে কত লোকের জীবন দুর্ব্বিসহ হইয়া উঠিবে।

আর একটা কথা সুস্পষ্ট—তিনি যে ঐ বিপ্লবীদের নেতা একথা আজ প্রায় সর্ব্বজনবিদিত, তাহা না হইলে এমন সব ঘটনা ঘটিতে পারিত না। তাঁহার ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারিত, আজ হোক্ কাল হোক্ কারাবাস তাঁহার অনিবার্য্য।

তিনি উঠিতেছিলেন, দোকানী প্রশ্ন করিল, ধলারা ভাল ত মাষ্টারমশাই ?

শচীনবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, আমি কি করে জানবো।

তিনি বাহির হইয়া ধীরে ধীরে চলিলেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই মিস্ রায়ের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিস্ রায়কে সংবাদ দিতেই তিনি আসিলেন। কুশল-প্রশ্নের পর শচীনবাবু বলিলেন, তা হলে কলকাতা আর যাচ্ছেন না ত ?

—যেতে আর দিলেন কই ?

—আমি দিলাম না !

—হ্যাঁ। বললেন, থাক্‌তে হবে—

—যা হোক্, আপনার উপর আমার অধিকার আছে একথা স্বীকার করলেন তা হলে ?

—আপনার কথাবার্ত্তা ক্রমশঃই ঘুর পথ নিচ্ছে।

—যাক সেকথা, নিশাযোগে আপনার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের প্রয়োজন হতে পারে—তার পথটা দেখিয়ে দিতে হয় !

—রাত্রে আমার বাসায় আসবেন ?

—হ্যাঁ! এর মধ্যে শুধু কর্ত্তব্যজ্ঞানই নয় একটু রোমান্সের গন্ধও যে রয়েছে।

—কিন্তু একথা বলতে আপনার একটু কুণ্ঠা বোধ করা উচিত ছিল।

— উচিত অবশ্যই ছিল, কিন্তু সঙ্কোচ বোধ করলে আর চলছে না।

—পেছনের দরজা টপ্‌কানো আপনার পক্ষে যদি অসম্ভব না হয় তবে এই জানালায় আসাও সম্ভব এবং

শচীনবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, সময় নিকট হয়েছে, বোধ হয আব অল্প কয়দিন। কিন্তু আপনার হাতে কত আছে?

—পোষ্টাপিসে শ-পাচেক আছে, তা ছাড়া আর নেই।

-যাক্ যথেষ্ট মূলধন আছে।

— আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত!

—আচ্ছা, আপাততঃ খুব সলজ্জ ভাবেই উঠি তা হলে। তবে হাতে কিছু টাকা বাখতে লজ্জিত হবেন না আশা কবি।

শচীনবাবু হাসিতে হাসিতে চলিয়া আসিলেন।

*

পবদিন সকালে ঘুম হইতে জাগাইয়া মীরা বলিল, শীগ্‌গির ওঠ। চা খাবে। শচীনবাবু বলিলেন, এখানে দাও।

—না, রান্নাঘরে চল।

শচীনবাবু রান্নাঘরে গেলেন। সেখানে বসিয়া ধলা। ধলা বলিল, স্যার যা হয় কিছু খেতে দিন। বড্ড ক্লান্ত—

—দারোগা মরলো কি করে?

—বলছি।

মীরা কয়েকটা মুড়ির মোয়া দিল—চায়ের জল গরম হইতেছে। ধলা দুর্ভিক্ষপীড়িতের মত খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর বলিতে

সুরু করিল,—শোভাযাত্রায় ওখানকার ছাত্র নিয়ে প্রায় দু'শ ছেলে ছিল। পতাকাবাহী লাঠিগুলো একটু শক্ত দেখেই নিয়েছিলাম, থানার নিকটবর্ত্তী হতেই বোধ হয় বেলা ১২টা হ'ল, তারা কিছু না বলেই হঠাৎ বেপরোয়া লাঠি চার্জ্জ করতে আরম্ভ করলে। কিছুক্ষণ মার খেয়ে অতিষ্ঠ হয়ে এক ঘা মারলাম দারোগাকে, কিন্তু এমনি চোট লাগল যে, সেই যে পড়ল আর উঠল না। দু'একজন কনেষ্টবলও ঘা খেয়েছিল, তারা পালিয়ে গেল—আমরাও ফিরে এলাম।

খানিকটা চা পান করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিল,—নৌকো ভাড়া করা ছিল, আমরা চলে আসবো, হঠাৎ সংবাদ পেলাম পুলিসের হুকুমে দাঙ্গা আরম্ভ হবে। তারা মুসলমানদের বেপরোয়া লুঠ-তরাজ কবতে হুকুম দিয়েছে—এখন মেয়েদের সবানো দরকাব। দু'খানা নৌকো বোঝাই করে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, অন্য একখানি মহাজনী নৌকোয় আরও কিছু এল ··তখনই অপর প্রান্তে লুঠতরাজ আর নারী নিগ্রহ আরম্ভ হয়েছে। সাহাদের বাড়ী লুঠ হয়েছে, একটা মেয়েকে—ধলা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল তার পর আবার সুরু করিল,—আমরা দেখলাম অন্ততঃ আধঘণ্টা তাদের আটকাতে না পারলে এদিকে সব বেরুতে পারবে না। তাই আমরা বাজারের রাস্তায় গেলাম তাদের মহড়া নিতে। মারামারি হ'ল, একটি ছেলে মাথায আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হ'ল, তাকে পাঠিয়ে দেখি, ওরা যেন একটু ভীত হযে দাঁড়িয়ে গেছে। এদিক ওদিক পালাচ্ছে—

আমরা চলে এলাম, তখন প্রায সন্ধ্যা, হেঁটে রওনা দিলাম রাস্তা ধরে। সারাদিন খাওয়া জোটে নি তবুও ছুটছি আমরা চারজন। ওরা সব ওপারের গ্রামে কোন আত্মীয়বাড়ীতে গেল। কি বিশ্রী রাস্তা, বর্ষার জলে কাদাময় হ'য়ে গেছে, ভেঙে গেছে মাঝে মাঝে, সাঁতার-জল, অন্ধকারে পথ চিনি না, তবুও চলেছি—

নদীর ধার দিয়ে আসতে আসতে কয়েকজন লোকের সঙ্গে দেখা। তারা মাছ ধরছিল। তাদের হাতে দেশী লণ্ঠন। স্বল্প আলোয় আমাদের ভিজা কাপড় আর চলার ভঙ্গি দেখে বোধ হয় সন্দেহ করেছিল, তার উপর অত রাত্রি। তারা বললে, 'দাঁড়াও, গ্রামের চৌকিদার আর প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা না করে যেতে পারবে না।' গ্রামের প্রায় সকল অধিবাসীই অন্য সম্প্রদায়ের লোক, তারা ওখানকার ব্যাপার জানত তাই বললে, 'সেখানে মারামারি করে আসছেন ত?' বললাম, না, মায়ের বিশেষ অসুখের খবর পেয়ে যাচ্ছি। তারা ছাড়লে না, আমরাও যাব না। শেষে তারা আমাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাবে বললে। দেহে তখন আর তিলমাত্র শক্তি নেই, তাই বললুম, তাঁদের ডেকে নিয়ে এস, আমরা তোমাদের টং-এ অপেক্ষা করছি। তাই হ'ল, জনা ছয়েক রয়ে গেল আর দুই জন চৌকিদার ডাকতে গেল।

ধলা আবার কয়েক চুমুক চা খাইয়া লইয়া বলিল, শেষে আমরা স্থির করলাম জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে হবে। হঠাৎ সুযোগ মিলল। আমরা জলে লাফিয়ে পড়লাম—

বর্ষার নদী, দুরন্ত স্রোত—ওদের হৈ চৈ ক্রমেই দূরে সরে গেল, বুঝলাম বেশ জোরেই ভাঁটিয়ে যাচ্ছি।···সারাদিন খাই নি, তার ওপর এই পরিশ্রম, স্রোতে টেনে নিয়ে যাচ্চে, বুঝলাম বাঁচবার আর আশা নেই, হাত পা শিথিল হয়ে আসছে, চারদিকে অন্ধকার, কোথায় তীর বুঝবার উপায় নেই। ভাবলাম এমনি ভাবে কত লোক মরেছে।··

হঠাৎ দেখি গায়ে কি একটা ঠেকলো—কলাগাছ। বেঁচে গেলাম। তার উপর চড়ে বসলাম, বোধ হয় ঘুমিয়ে ছিলাম। কিছুই জানি না—ভোরে দেখি, ষ্টিমার-ষ্টেশনের ফ্লাট দেখা যাচ্ছে আর আমি স্রোতের

দুয়ানিতে পড়ে ঘুরপাক খাচ্ছি। তখন একটু চেষ্টা করে উঠে এলাম। ওয়ারেণ্ট ত আছেই—তারপর সরাসার একেবারে বাড়ীতে চলে এলাম। মা ভাত রাঁধছে, ভাবলাম খেয়েই চলে যাব ··

হঠাৎ কে যেন বাহির হইতে ডাকিল, স্যার।

শচীনবাবু বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, যে কয়েকটি ছাত্র তাহাকে ও মিস্ রায়কে জড়াইয়া একটা রোমান্স সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের একজন দাঁড়াইয়া।

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কি হে ?

—আমাদের স্কুল কবে খুলবে স্যার ?

—সোমবার।

শচীনবাবু অত্যন্ত সংক্ষেপে উত্তব দিয়া আসিলেন। ধলা তখনও গোগ্রাসে মোয়া খাইতেছে। শচীনবাবু বলিলেন, শীগগিব যা, ওবা ঠিক টের পেয়েছে—এসেছে কবে স্কুল খুলবে জানতে।

ক্লান্ত পা দুটিতে ভর দিয়া দরজা ধরিয়া ধলা উঠিযা দাঁড়াইযা বলিল, বড় দুঃখ স্যার, যারা আমাদের এত কষ্ট দিলে তাদেব একজনও ইংরেজ নয়, তারা আমাদের দেশবাসী আমাদের ভাই—

শচীনবাবু বলিলেন, পিছনেব দরজা দিযে, ময়রাবাড়ীর ভিতর দিযে চলে যা—নইলে বিপদ আছে।

ধলা প্রণাম কবিযা চলিয়া গেল। শচীনবাবু বাস্তায বাহিব হইযা দেখিলেন অত্যন্ত ভালমানুষ ছাত্রটি মোড়ের চায়ের দোকানে মণিবাবুকে কি যেন বলিল—তিনি হন্ হন্ করিয়া ছুটিলেন সম্ভবতঃ পুলিশে খবব দিতে।

শচীনবাবু আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মীরা শিগ্গির একটা কাজ কর। তুমি ধলাদের বাড়ী চেনো ত ?

—হ্যাঁ, কেন ?

—শীগ্‌গির ভেতর দিয়ে গিয়ে বলে এস ধলা যেন না খেয়েই চলে যায়, নইলে দশ বারো মিনিটের মধ্যে ধরা পড়বে।

মীরা ইতস্ততঃ করিতেছিল, কেউ আমাকে চেনে না—

—তাতে কি ?

মীরা তাড়াতাড়ি রওনা হইল।

শচীনবাবু উৎকণ্ঠিত ভাবে বসিয়া রহিলেন। খোকা আঙ্গিনার প্রান্তে একা একাই 'বন্দেমাতরম্' জুড়িয়া দিয়াছে। চীৎকার করিয়া বলিতেছে—বিশ্বাসঘাতকের বিচার হবে—বৃটিশ নিপাত যা—সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, বোম ফেলেছে জাপানী, ইত্যাদি।

মীরা ফিরিয়া আসিয়া বলিল, আমি যেতে পারলাম না, পুলিসে ঘিরে ফেলেছে ওদের বাড়ী—তাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে—

শচীনবাবু আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ওঃ—

সারাদিন অনাহারে থাকিয়া, জীবনপণে হাঙ্গামাকারীদের প্রতিরোধ করিয়া মেয়েদের ইজ্জত রক্ষা করিয়াছে, দশ মাইল দুর্গম পথে হাঁটিয়াছে, চৌদ্দ মাইল জলে ভাসিয়া আসিয়াছে, তাহাকে কিছুই খাইতে পর্য্যন্ত দেওয়া হইল না আর মায়ের রান্না ভাত ক'টিও সে মুখে দিবার সময় পাইল না, এই কি বিচার, বিধাতার ন্যায় ও সত্যের রক্ষণ! অভিমানে দুঃখে ক্ষোভে শচীনবাবুর চোখ বাহিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

মীরা বলিল, তুমি কাঁদছ ?

—ওঃ, ধলা দুটো ভাত খেয়েও যেতে পারলে না !

এই কথাটায় মীরার মাতৃহৃদয়ও কাঁদিয়া উঠিল—আহা তার খোকার মত ধলাও তার মায়ের আঁচলের নিধি, তাহাকে তিনি খাইতে দিতে পারিলেন না। মীরা ছুটিয়া গিয়া খোকাকে কোলে করিয়া অজস্র চুম্বনে তাহার স্নেহ আর আশীর্ব্বাদ ঢালিয়া দিল।

*

ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর আবর্ত্তন নিয়মিতই চলিয়াছে—

মানুষের আইন-আদালত, মামলা-মোকদ্দমা, খাওয়া-পরা, শোওযা-বসা—সবই চলিয়াছে সেই একই নিযমে। ফুল ফুটিযাছে, ঝরিযা পড়িয়াছে, বীজে অঙ্কুর হইযাছে, ফলে বীজ সঞ্চয হইয়াছে, কেবলমাত্র কয়েকটি পতঙ্গধর্ম্মী প্রাণ আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, অন্ধকার জনসমুদ্রে আবর্ত্তসঙ্কুল গভীর তলদেশে ক্ষতবিক্ষত দেহে আলোড়ন স্থষ্টি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে। কিন্তু সমুদ্রেব উপরিভাগ নিস্তরঙ্গ, নিষ্ঠুব নীরবতায় মৌন।

শহর নীরব—নিশ্চিন্ত আলস্যে, নিস্মম স্তব্ধতায দিনেব পব দিন চলিযা যাইতেছে।

সাহিত্য সমিতির আব একটি অধিবেশন হইযাছে মিঃ সেনেবই বাড়ীতে। অধিবেশনটি উৎসবমূলক, গান-বাজনায় বেশ জমিযাছিল। উৎসাহে অখিলবাবু পর্য্যন্ত একটা আবৃত্তি করিয়া ফেলিযাছিলেন।

শচীনবাবুর কাজ নাই। মিঃ সেন মাঝে মাঝে ডাকেন, মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা হয়। অনিলবা হাজতে দিনাতিপাত করিতেছে। এখনও রায় বাহির হয় নাই।

সেদিন সকালে অমনি একটা আলোচনা হইতেছিল। ববিবার, মিঃ সেন তাই আজ একেবারে বেপরোযা, আলোচনার গতিতে মনে হয বারটার পূর্ব্বে সমাপ্ত হইবে না। শচীনবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন সেখান হইতে পর্দ্দার ফাঁকে বাড়ীর ভিতরের সামান্য একটু দেখা যায়।

অকস্মাৎ পর্দ্দাটা ফাঁক হইয়া মিঃ সেনের সামনে দুই কাপ চা ও দুইখানি বিস্কুট রক্ষিত হইল। বোঝা গেল মিসেস সেন স্বয়ং দিযা গেলেন। কিন্তু ব্যাপারটা অস্বাভাবিক কারণ চাকরটী বাড়ীতেই ছিল।

এই আকস্মিক চা দানের ব্যাপারে পর্দ্দাটা একটু বেশী ফাঁক হইয়া রহিল।

মিঃ সেন চা লইয়া আসিলেন। চা পান করিতে করিতে শচীনবাবু দেখিলেন, এবার রান্নাঘরের দরজা পর্য্যন্ত দেখা যায়। মিসেস্ সেন কয়েকবার আনাগোনা করিলেন এবং একবার চোখাচোখি হইতেই একটি আঙুল দেখাইয়া স্মিতহাস্যে চলিয়া গেলেন।

শচীনবাবু বুঝিলেন, অনিলদের এক মাসের জেল হইয়াছে। ফিরিবার মুখে শচীনবাবু যথাস্থানে সংবাদটি দিয়াও আসিলেন।

*

ধলারা যে কয়জন একসঙ্গে জলে ঝাঁপ দিয়াছিল তাহাদের সকলেই ফিরিয়াছে, কিন্তু ফেরে নাই শুধু একজন। দুই বৎসর টেষ্টে ডিস্‌এলাউড হইয়া সে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। শচীনবাবু ব্যথিত হইলেও বিচলিত হন নাই, আজ তাঁহার সুস্পষ্ট ধারণা, ইহারা আজ হোক, কাল হোক, দশ বছর বাদে হোক সকলেই ডুবিবে, কেহই বাঁচিবে না। ইহারা সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিবার জন্য জন্মায় নাই।

আজ কয়েকদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার। শেষ ভাদ্রের রৌদ্রে বর্ষণক্লান্ত আকাশ উজ্জ্বল আর পৃথিবী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুক্লপক্ষের সপ্তমী হইবে, সৌখীন নরনারী সন্ধ্যার পরে নদীর ধারে, রাস্তায় বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। চলমান মেঘের ছায়ায় আলো-আঁধারে বর্ষাস্নাত পৃথিবীর শ্যামলতা আনন্দময়—

কয়েকজন মহিলা আজ শচীনবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিয়াছেন। এমন বেড়ানটা এই ক্ষুদ্র শহরের রেওয়াজ। তাঁহার অবস্থিতি মহিলাগণের আনন্দের অন্তরায় হইবে মনে করিয়া শচীনবাবু বাহির হইয়া যাইতেছিলেন একটি বধু আসিয়া প্রণাম করিল।

মুখ দেখিয়া বুঝিলেন এটি ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ। তিনি প্রশ্ন করিলেন, কি? ভাল বৌমা!

—হাঁ।

—তার পর সকলে ভাল আছে?

—হাঁ, আজ ন'টার পর সত্যদা আসবে সেইখানে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। যাবেন—

যাবো?

—হাঁ, সোজা রান্নাঘরে চলে যাবেন, চেনেন ত?

—আচ্ছা।

শচীনবাবু বাহির হইয়া আসিলেন। পথে শিক্ষকগণের সহিত সাক্ষাৎ—তাঁহারা মিস্ রায ঘটিত ব্যাপারের সাম্প্রতিক কিংবদন্তী সম্বন্ধে মুখরোচক বহু সংবাদ জানাইলেন।

আজ অন্ততঃ তাঁহার বসিকতায প্রবৃত্তি ছিল না, তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, অন্যত্র চাকুরীর দরখাস্ত কবতে হবে—

সুরেনবাবু কহিলেন, মণিবাবু এ ব্যাপারটা নিযে অত মাথা ঘামাচ্ছেন কেন বলতে পারেন?

—উনি সম্ভবতঃ ওখানকার হতাশ প্রেমিক ভাই—

শচীনবাবু জানিতেন, ক্রমাগত তাঁহাকে ও মিস্ বায়কে জডাইয়া এই কুৎসা প্রচারের ফলে একদল ছাত্রছাত্রী তাঁহাদের উপর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে এবং সাহিত্য সমিতিটা যে মুখ্যতঃ উক্ত প্রণয়-লীলার ক্ষেত্রবিশেষ তাহা প্রায় সকলেই নিঃসংশযে বিশ্বাস করিয়া ফেলিয়াছে। এদিকে ধলাব গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব দলের সকলেই গ্রেপ্তার হইয়া গিযাছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধে খুনের চার্জ্জ দাখিল করা হইয়াছে। হযত ধলার ফাঁসিও হইতে পারে। এমন কত জনের ফাঁসি হইয়াছে— হইবে।

মণিবাবুর ভাই যাহাকে ছোরা মারিয়া পেটফুটা করিয়া দিয়াছিল তাহার দুই বৎসরের জেল হইয়া গিয়াছে, এবং মণিবাবুর ভ্রাতা বেকসুর খালাস পাইয়াছে। তাহার পিতা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণের খরচ আদায় করিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া সাক্ষ্য দিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যৎসামান্য মুনাফাও হইয়াছে।

*

রাত্রি নটায় ডাক্তারবাবুর বাড়ীর সাম্‌নের গলিটা একেবারে জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। শচীনবাবু একটু শঙ্কিত পদক্ষেপে একবার পায়চারি করিয়া দেখিলেন—এদিকে ওদিকে কোথায়ও কেহ নাই। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ভয়ে ভয়েই বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন। রান্নাঘরের দরজায় বসিয়া আছে ডাক্তারবাবুর পুত্রবধূ, অন্য কেহই বাড়ীতে নাই, শাশুড়ী সম্ভবতঃ গৃহান্তরে। একটা কেরোসিনের ডিবার শীর্ণ শিখা মাঝে মাঝে বাতাসে কাঁপিয়া কাঁপিয়া পুঞ্জীভূত ধূম উদ্‌গীরণ করিতেছে।

বৌমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া শচীনবাবুকে পাশের ঘরে লইয়া গেল। ক্ষীণ প্রদীপের আলোকে ঘর স্বল্পালোকিত, সত্য শুইয়া আছে মনে করিয়া তিনি পাশে যাইয়া বসিলেন। সত্য উঠিয়া বসিল।

শচীনবাবু সত্যকে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন, এ যেন সত্যর প্রেতাত্মা—শীর্ণ চেহারা, গায়ের রং রোদে পুড়িয়া তামার মত হইয়াছে, একমুখ দাড়ি-গোফ, মনে হয় বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। চোখে সে দীপ্তি, দৃষ্টিতে সে নির্ভীকতার অভিব্যক্তি নাই। নিষ্প্রভ কোটরগত চোখে একটা ম্লানিমার কারুণ্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। মনে হয় যেন দীর্ঘদিন রোগে ভুগিয়া উঠিয়াছে।

—কেমন আছ?

—ভাল নয়, আজ একমাস রক্ত আমাশয়ে ভুগছি। রাত-জাগা

পরিশ্রম অনাহার—শরীরের উপর কম অত্যাচার তো হয় নি স্যার, সুতরাং শরীরের আর দোষ কি ?

কেমন করে দিন কাটাচ্ছ ?

সত্য বলিয়া গেল অনেক কাহিনী, হাঁটিয়া সাঁতরাইয়া কত পথ যাইতে হইয়াছে। পুলিশের ভয়ে, গ্রাম্য লোকের ভয়ে কালো হাঁড়ি মাথায় দিয়া জলে রাত্রিবাস করিতে হইয়াছে। চারিপাশের অগুন্তি জোঁক গায়ে লাগিয়া দেহে ছিদ্র করিয়া রক্তপান করিয়াছে। সেই সব ক্ষত শুকাইতে দীর্ঘ দিন লাগিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসী সহায়তা করিয়াছে, অনুবর্ত্তী হইয়া বৈপ্লবিক কাজ করিয়াছে, কোথায়ও আবার পুলিসে খবর দিয়া হয়রাণ করিয়াছে। কোথায়ও গ্রামবাসীরাই তাড়া করিয়াছে, ছুটিয়া বা আত্মগোপন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছে, পাটের জমিতে ভাঁপ্‌সা গরমে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন কাটাইতে হইয়াছে—

সত্য স্মিতহাস্যে নিজেদের দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা করিয়া থামিল। শচীনবাবুর মনে প্রশ্ন জাগিয়াছিল, এত কৃচ্ছ্রসাধনের ফল কি হইল ? কিন্তু সে প্রশ্ন তিনি করিলেন না।

সত্য কহিল, আর ত কর্ম্মী নেই, সবই জেলে, এখন কি করা যায়।

—কর্ম্মী থাকলেই বা কি হ'ত ?

—সত্যই তাই, বাইরের চেয়ে ঘরের শত্রু এত বেশী যে মনে হয় আর যেন পারি না।

—নিজেকে বাঁচাতে হলে ধরা দেওয়া ছাড়া পথ নেই। আর কিছু করাও সম্ভব নয়।

—তবে তাই করব। আর পারছি না যেন! কিন্তু আপনি এতদিন কি করে জেলের বাইরে আছেন সেইটেই আশ্চর্য্য।

—কেন ?

—সকলেই ত জানে যে আপনি আমাদের নেতা ?

শচীনবাবু সবিস্ময়ে বলিলেন, নেতা? বল কি সত্য, আমি ত কাজে কিছুই করি নি। ঘরে বসে কেবল হা হুতাশ করেছি একটু আধটু·

—আপনার প্রতি সকলের শ্রদ্ধাই এতদূর এগিয়ে দিয়েছে আমাদের, নইলে কি ছেলেরা এত নির্ভীক হতে পারত?

—থাক্, সে কথা।

সত্য একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ভাগ্যিস, সাহিত্য সমিতি প্রতিষ্ঠার বুদ্ধিটা মাথায় এসেছিল। নইলে দু'দিনেই সব খতম হয়ে যেত। আচ্ছা এখন মেয়েদের দ্বারা কি কিচ্ছু হওয়া সম্ভব নয়?

—তারাই জানে।

বৌমা অদূরে অপেক্ষা করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন, কি করবে?

—ধরুন, যদি এখানকার পোষ্টাপিসটা পুড়িয়ে দিতে পারত?

অবশ্য একটা প্রাণ কি দুটো প্রাণ যেত, কিন্তু·

—তা অঞ্জলি শ্যামলী পারে—

শচীনবাবু বলিলেন, তার প্রয়োজন কি? তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এমন কোন ক্ষতি হবে না—

—নাই হোক্, তাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া তো হবে, অন্ততঃ দুনিয়ার লোক জানবে এদের কৃত অত্যাচারকে জাতি মাথা পেতে নেয় নি।

ঘরের পিছনে শুষ্কপত্রে পদধ্বনির মত একটা শব্দ শোনা গেল। বৌমা ত্বরিতপদে পিছন দিক দিয়া বাহির হইয়া গেল। সত্য ফুঁ দিয়া প্রদীপটা নিবাইয়া দিল।

নিবিড় অন্ধকারে শচীনবাবু ও সত্য মুখোমুখি নিঃশব্দে রুদ্ধনিশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। আবার একটা শব্দ হইল—আবার! সত্য চুপি চুপি প্রশ্ন করিল, পথে কি কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

—না।

বৌমা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, সম্ভবতঃ গরু—ভয় নেই।

সত্য বলিল, তা হলে বরিশাল চলে যাই, সেখানে যদি সম্ভব হয় জিরিয়ে নেব, না হয় একেবারে জেলে গিয়েই বিশ্রাম।

—সে মন্দের ভাল। এমনি করেও ত বাঁচবে না। খরচের টাকা আছে?

না।

শচীনবাবু অন্ধকারে নিজের আংটিটা টানাটানি করিতেছিলেন, কিন্তু তাহা খুলিতেছে না। বলিলেন, আংটিটা খুলে নাও, আর ত কিছু নেই। এটা তো খুলছে না—

বৌমা বলিল, না থাক, এই আংটিটা নিন্—সে নিজেব আংটি খুলিয়া দিল।

—কিন্তু—

পুকুবের ঘাটে হারিয়ে গেছে বললেই হবে। আর এই দুল জোড়া আপনি রাখুন ভবিষ্যতের জন্য—

শচীনবাবু অন্ধকারে হাত পাতিযা দুইটিই লইলেন, একটা সত্যব হাতে দিয়া অন্যটি পকেটে রাখিলেন। বর্ত্তমানে এসব দান গ্রহণ করিতে তাঁহার আর সঙ্কোচ বোধ হয় না। নিজেব আংটিটাও সত্যকে দিয়া কহিলেন, এটাও রাখো হয়ত কাজে লাগবে।

শাশুড়ী বৌমাকে ডাকিলেন, সে রান্নাঘরের প্রতিফলিত স্বল্পালোকে দাঁড়াইয়া বলিল, যতক্ষণ না আসি যাবেন না যেন।

সত্য বলিল, দুটো জিনিষ আপনার কাছে দেব গচ্ছিত রাখতে।

—কি?

—কতকগুলি কংগ্রেসের নির্দ্দেশ, ইস্তাহাব আর—

—আর কি?

—আর একটা আগ্নেয়াস্ত্র, ও কিছু রসদ—

শচীনবাবু একটু যেন বিস্মিত হইলেন, তাহার পর বলিলেন, দিয়ো··· আচ্ছা এখুনি দাও নিয়ে যাচ্ছি।

—না না, আপনি নেবেন না। কাল বৌদি গিয়ে দিয়ে আসবে— একটু সাবধানে রাখবেন যদি কোন কর্ম্মী আসে তার আত্মরক্ষার জন্যে দেবেন। অনেক সময় প্রয়োজন হয়।

—তাই হবে!

বৌমা আসিয়া শচীনবাবুকে বলিল, আপনি আসুন।

শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সদর দরজা দেওয়া ছিল, বৌমা তাহা খুলিয়া পুনরায় বন্ধ করিয়া দিয়া বলিল, পুলিস এসে গেছে!

—কেন?

—বোধ হয় সার্চ্চ করবে, সত্যদাকেও পালাতে হবে এক্ষুনি। দাঁড়ান দেখি—

শচীনবাবু নির্ব্বাক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, সত্য পিছন হইতে আসিয়া বলিল, আপনি আর আমি একসঙ্গে ধরা পড়লে কিন্তু সত্যিই আমি আনন্দিত হই।

—তার মানে?

—লোক জানবে, আমি আপনার সত্যিকার অনুগত ছাত্র।

—কিন্তু সে দুটি জিনিষ?

—সে পুলিশ পাবে না। তার জন্যে চিন্তা নেই স্যার।

বৌমা আসিয়া জানাইল, পিছনের খিড়কিতেও পুলিস দাঁড়াইয়া আছে।

সত্য একটু হাসিয়া বলিল, বেশ লাগছে কিন্তু, ওদের ফাঁকি দিতে পারলে বেশ একটু আমোদ হ'ত—

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হইল। বৌমা জানালা দিয়া জানাইল, ডাক্তারবাবু বাড়ীতে নেই·· না, কোন পুরুষমানুষ নেই·· না খুলব না দরজা।···ওঁকে ডিসপেন্সারি থেকে ডেকে আনুন।

বৌমা আসিয়া বলিল, আপনারা খিড়কি দরজার আড়ালে থাকবেন, আমি জল আনতে যাচ্ছি। ফাঁক পেলেই চলে যাবেন—

বৌমা কলসী কাঁখে লণ্ঠন লইয়া আসিয়া খিড়কির দরজা খুলিল, লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল দুই জন কনষ্টেবল দাঁড়াইয়া আছে। বৌমা একটু ঘোমটা টানিয়া বলিল, একটু সরে যান, আমি জল আনতে যাব

কনষ্টেবল দুই জন পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইল। সরু গলি—ঘরের বাঁকটা ঘুরিয়া একটু আগাইলেই টিউব ওয়েল। টিউব ওয়েলে শূন্যোদর কলসী পূর্ণ করিবার শব্দ হইল, এবং আলোটা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।

ঘরের কোণে আসিয়া বৌমা হঠাৎ চিৎকার করিয়া উঠিল—"সাপ, সাপ, ওরে বাবা রে, সাপে কেটেছে।" হাতের লণ্ঠনটি ছিট্‌কাইয়া নিভিয়া গেল।

কনষ্টেবল দুইটি সেই অন্ধকারে টর্চ্চের আলো ফেলিতে ফেলিতে ছুটিয়া গেল আর্ত্ত নারীকণ্ঠকে অনুসরণ করিয়া। সত্য নিঃশব্দে শচীনবাবুর হাত টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। বাম দিকে ঘুরিয়া একটা পুকুরের পাড়ে আসিয়া শচীনবাবু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন আর রাস্তা নাই।

সত্য পুকুরের পাড়ে একটি ঘরের পিছনে গিয়া সঙ্কেতসূচক শব্দ করিল, সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলিয়া গেল। সত্য শচীনবাবুকে লইয়া সে বাড়ীর উঠান পার হইল।

আর একটা গলির মোড়ে আসিয়া সত্য বলিল, এই পথে যান—দত্তদের দোকানের পিছন দিয়ে সদর রাস্তায় পড়বেন। সত্য চলিয়া গেল। শচীনবাবু হাতড়াইতে হাতড়াইতে সদর রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। রাস্তার মোড়ে জনতা—তাহারা বলিতেছে, ডাক্তারের বাড়ী সার্চ্চ হচ্চে—আর বেটার বৌকে সাপে কামড়েছে তবুও নিস্তার নেই।

পরদিন সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়া ফিরিয়া শচীনবাবু শুনিলেন বৌমা জিনিষ দুইটিই বৈকালে দিয়া গিয়াছে। মীরা তাহা রাখিয়া দিয়াছে নির্ভয়ে এবং সম্পূর্ণ জ্ঞাতসারে। মীরা শুধু কহিল, কোথায় রাখবে ভাল করে রাখ—

কতকগুলি পুরানো পরীক্ষার খাতা তাকের উপর ছিল, শচীনবাবু ইস্তাহারগুলি তাহার মাঝে রাখিয়া আগ্নেয়াস্ত্রটিকে উপরে একটা স্থানে সংগোপনে রাখিলেন। কেবলমাত্র বসিয়াছেন ঠিক এমনি সময়ে ধলাদের দলের রঞ্জন আসিয়া উপস্থিত। সকলেই গ্রেপ্তার হইয়াছে, কিন্তু এই ছেলেটি আশ্চর্য্য উপায়ে ধরা পড়ার হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে। দারোগাহত্যার পরে সে নিকটবর্ত্তী এক আত্মীয়বাড়ীতে দুই-চার দিন থাকিয়া পরে আসিয়াছিল।

রঞ্জন প্রশ্ন করিল, সত্যদা কেমন আছেন?

শচীনবাবুর চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল সত্যের বিশীর্ণ শুষ্ক মুখখানা, সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি ও করুণায় তাঁহার হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, ভাল নেই, আমাশয় হয়েছে আর সে পারে না।

—অসুখ বেশী?

—না, তবে শরীর একেবারে ভেঙ্গে গেছে, অথচ কোথাও একদিনের জন্যে বিশ্রাম নেবার উপায় নেই, চারিদিকে হয় পুলিশ না হয় রাজভক্ত প্রজা—

—আর কতদিন পারবেন এমনি করে?

আমিও তাই বলেছি তাকে, আর এমনি করে পালিয়ে বেড়িয়ে লাভ কি? এ জাতির সবাই জড়বুদ্ধি, স্বার্থপর, অলস, আত্মকেন্দ্রিক—পরাজিতের মনোবৃত্তি আর আত্মসম্মান-জ্ঞানের অভাব এদের মজ্জাগত।

কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পরে রঞ্জন অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল, সত্যদা কোথায়, তার কাছে যাওয়া ছাড়া তঃকোন কাজ নেই আর—

আত্মগত ভাবে শচীনবাবু বলিলেন, আজ রাত্রের ষ্টীমারে বরিশাল যাবে, যদি বাইরে থাকতে পারে তবে হয়ত কর্ম্মক্ষেত্র খুঁজে পাবে।

—আমিও তা হলে বরিশালে যাই—

রঞ্জন আলোচনাকে যেন অনাবশ্যকরূপে এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে সংক্ষেপ করিয়া উঠিয়া গেল।

রঞ্জন চলিয়া যাইবার পর শচীনবাবুর হঠাৎ সন্দেহ হইল কথাটা বলিয়া ফেলিয়া ভাল হয় নাই, এতদিন ত অমন ভুল তাহার হয় নাই। রঞ্জন চলিয়া গেল এমনি ভাবে যেন সে একটা কিছু হদিস পাইয়াছে। তার উপর, ধলাদের সঙ্গে বহু নিরপরাধ লোকও জেলে গিয়াছে—কিন্তু ঐ ছেলেটি কারাদণ্ডের হাত হইতে বাঁচিয়া গিয়াছে—কেন? সন্দেহ ঘনীভূত হইয়া উঠিল, রঞ্জনের পশ্চাদনুসরণ করিবার উদ্দেশ্যে শচীনবাবু তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন কিন্তু রাস্তায় সে নাই, কিন্তু এত শীঘ্র গেল কোথায়? তিনি একটু আগাইয়া আসিয়া মোড়ে দাঁড়াইলেন, বড় রাস্তায়ও নাই—একটু এদিক ওদিক চাহিয়া দেখেন রঞ্জন চায়ের দোকানে খাবার খাইতেছে, মণিবাবু দোকানে বসিয়া আছেন।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিলেন বিমর্ষভাবে। এত বড় একটি ভুল তিনি মুহূর্ত্তে করিয়া বসিলেন কেমন করিয়া? ইহার পেছনে যেন রহিয়াছে নিয়তির দুর্জ্ঞেয় বিধান। মীরা প্রশ্ন করিল, কি হ'ল?

—সত্য বোধ হয় কালই ধরা পড়বে!

ভালই ত, তার যা শরীরের অবস্থা তাতে সে-ই ভাল হবে।

শচীনবাবু যেন সান্ত্বনা পাইয়াছেন এমনি ভাবে বলিলেন, হয়ত ভালই হ'ল। বৃথা আর কেন?

মীরা বলিল, তুমি দুঃখিত হচ্ছ কেন? সে ভালই হয়েছে।

শচীনবাবু দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিলেন—কিন্তু মীরা জানিল না কেন?

পরদিন বেলা ১২টার মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল সত্য ষ্টীমারষ্টেশনেই গ্রেপ্তার হইয়াছে। ওখানকার লোকেরা তাহাকে মাল্যভূষিত করিয়া জয়ধ্বনি করিয়াছে। এই বাহবা ও জয়ধ্বনির নিস্ফল সঞ্চয়কে হাত পাতিয়া গ্রহণ করিয়া সে কারাগারের প্রবেশদ্বার পার হইয়াছে।

যদিও ইহাতে বিমর্ষ হইবার যথেষ্ট কারণ নাই তবুও দেশসেবক কারাবরণ করিয়াছে এই সংবাদ পাইবার পরই শচীনবাবুর মনটা অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িল। মিস্ রায়ও সংবাদটা জানিয়াছেন, কিন্তু কেমন করিয়া শচীনবাবু স্বীকার করেন যে এ ব্যাপার তাঁহারই অনিচ্ছাকৃত ভুলের পরিণাম। সারাটা দিন একটা অব্যক্ত অস্বস্তিতে কাটিয়া গেল। মিস্ রায়ের সহিত দেখা করিতে যেন লজ্জা করিতেছিল।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পরে অকস্মাৎ রিজিয়া আসিয়া প্রণাম করিল। প্রণাম করাটা দেখিয়া তিনি একটু বিস্মিত হইলেন। প্রশ্ন করিলেন, কি?

—দু'দিন পড়াতে যান নি, তাই ভাবলুম আপনার অসুখ করেছে।

—না ভালই আছি। শচীনবাবু তাকাইয়া দেখিলেন রাস্তায় রিজিয়ার একজন বান্ধবী দাঁড়াইয়া আছে।

—ওঃ ওদের ডাকো, বাইরে রয়েছে—

—না, আজ শেষরাত্রে আপনার বাসা সার্চ্চ হবে তাই বলতে এলাম। যা আছে সরিয়ে ফেলুন—

—কেন?

—সত্যদার কাছে আপনার আংটি পাওয়া গেছে। আপনার ছাত্রেরা সনাক্ত করেছে।

—ওঃ ভাল কথা—

রিজিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে দরজার নিকট হইতে প্রশ্ন করিল—কাল যাবেন ত?

—হ্যাঁ, যদি শরীরটা ভাল থাকে।

রিজিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু আশ্চর্য্য হইলেন। এই মেয়েটি ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ধর্ম্মের; কিন্তু কেমন আন্তরিকতার সহিত এই সব কাজের সঙ্গে জড়াইয়া পড়িতেছে, কিসের জন্য বৈপ্লবিক কাজে তার এত অনুরাগ? এমন সুন্দরী, এমন চমৎকার স্বভাব। মেয়েটি বিধর্ম্মী না হইলে যেন তিনি খুশী হইতেন।

যাহাই হোক এ সংবাদটা ভাল নয়, এখন অকারণ গ্রেপ্তার হইয়া মীরাকে বিপন্ন করিবার কোন মানে হয় না। আজ রাত্রেই যেমন করিয়াই হোক ওটাকে সরাইতে হইবে। কিন্তু কোথায়? একমাত্র মিস্ রায় ছাড়া আর কে আছে? আর সত্যর গচ্ছিত বস্তুকে রক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য—ধর্ম্ম।

মীরাকে তিনি সবই জানাইলেন।

*

সেদিন রাত্রে মাঝে মাঝে আকাশের পানে চাহিয়া দেখিতেছিলেন শচীনবাবু। কোথাও এতটুকু মেঘ নাই। স্বচ্ছ সুন্দর জোছনায় পৃথিবী ঝলমল করিতেছে। শচীনবাবু পরিপূর্ণ জোছনা দেখিয়া একটু যেন হতাশ হইলেন। আজ যে নিবিড় অন্ধকারেরই প্রয়োজন।

আহারাদির পর মীরা ও শচীনবাবু নীরবে বারান্দায় বসিয়াছিলেন, কিন্তু এমন দিবালোকের মত সুপরিস্ফুট জ্যোৎস্নায় শচীনবাবু যেন সাহস পাইতেছিলেন না। কিছুক্ষণ বাদে রাত্রি প্রায় একটার সময় কতকগুলি খণ্ড মেঘ প্রদীপ্ত গোলকের মত চাঁদের উপর দিয়া দ্রুত ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। পৃথিবী একটা ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় অস্বচ্ছ হইয়া উঠিল।

শচীনবাবু বলিলেন, দাও ত মীরা, এখনই যেতে হবে—

মীরা আগ্নেয়াস্ত্র আনিয়া দিল, শচীনবাবু মনে মনে ভাবিলেন যদি তেমনিই হয়, না হয় আগ্নেয়াস্ত্র একবার ব্যবহারই করিবেন। ব্যবহার-কৌশল তিনি না জানেন এমন নয়। তিনি স্বল্পালোকে গুলি কয়েকটি ভরিয়া লইলেন এবং নীল রংঙের একটা ছিটের জামা পরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

রাস্তা নির্জ্জন, কেহ কোথাও নাই। নগরী নিশ্চিন্ত সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন। তিনি পিছনে, সামনে চাহিয়া চলিলেন—স্বল্পালোকিত চিরপরিচিত পথ—গরমে দুই-একজন দোকানী বাহিরে বেঞ্চে শুইয়া আছে। কে যেন অদূরে বিকৃত কণ্ঠে গান করিতে করিতে ফিরিতেছে—আনন্দের রেশটুকু যেন এখনও রহিয়াছে তাহার মনে।

মোড়ের মাথায় পুলিশ থাকে—কিন্তু দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন কেহ নাই। মোড়ের বিড়ির দোকানটা বন্ধ। সম্ভবতঃ কেহ নাই।

একখানা ঘন কালো মেঘ অকস্মাৎ চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া দিল—পথ আর দেখা যায় না। বিধাতার ইঙ্গিত মনে করিয়া তিনি তাড়াতাড়ি মোড়টা পার হইতে অগ্রসর হইলেন।

মোড়টা প্রায় অতিক্রম করিয়াছেন ঠিক এমনি সময় পিছন হইতে কে বলিল, ঠারিয়ে।

শচীনবাবু হাতের অস্ত্রটিকে ভাল করিয়া ধরিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। সেই কনেষ্টবলটি। সে আজও নোকরী ছাড়ে নাই। আজ রোঁদের পালা তারই।

শচীনবাবু একটু যেন হতভম্বের মত দাঁড়াইলেন—কি কর্ত্তব্য বুঝিলেন না। কনেষ্টবলটি কহিল, আইয়ে মাষ্টারসাব—সেলাম। লেড়কা লোক ঘুমতা, জলদি যাইয়ে।

সে অত্যন্ত ভালমানুষটির মত দোকানের আড়ালে তার টুলে গিয়া বসিল। শচীনবাবু অগ্রসর হইলেন। অদূরেই বালিকা বিদ্যালয়—রাস্তা হইতে এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন—কেহ কোথাও নাই।

দেয়ালের পাশ দিয়া তিনি নিঃশব্দে পিছনে গেলেন—পুকুরপাড়ে ছোট গেট, কিন্তু প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। বহু কষ্টে উপরে উঠিয়া লাফাইয়া পড়িলেন—শব্দ একটু হইল।

কিন্তু আলো—বোর্ডিং ঘরে! সর্ব্বনাশ, ছাত্রীরা দেখিলে কি ভাবিবে! তাহারা মনে মনে সন্দেহ না করে এমন নয়। গেট খুলিতে গেলেও শব্দ হওয়া অনিবার্য্য।

একটু দাঁড়াইয়া তিনি কান পাতিয়া শুনিলেন, কোন সাড়াশব্দ নাই। মনে হয় না যে কেহ জাগিয়া আছে। একটু একটু করিয়া বোর্ডিঙের জানালার নিকটে আসিলেন—একটি ছাত্রী আলো জ্বালাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে এইমাত্র।

শচীনবাবু স্বস্তির সঙ্গে আগাইলেন। মিস্ রায়ের ঘরে মৃদু আলো জ্বলিতেছে, মশারির ভিতরে তাঁহার ঘুমন্ত দেহখানা আলোর পরিপ্রেক্ষিতে সুস্পষ্ট। কিন্তু মশারি হাতে নাগাল পাওয়া যায় না—জানালা হইতে দূরে।

উঠানে একখানা পাকাটি জোছনায় চিক্ চিক্ করিতেছিল, সেটি লইয়া তিনি মশারি তুলিয়া মিস্ রায়ের পায়ে একটা খোঁচা দিলেন। মিস্ রায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

শচীনবাবু মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, দরজা খুলুন।

—কে? শচীনবাবু?

—হ্যাঁ।

মিস্ রায় দরজা খুলিয়া দিতেই শচীনবাবু ঢুকিয়া পড়িলেন। বলিলেন, চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করেন নি এই ঢের।

—করা উচিত ছিল, অমনি করে খোঁচা দেয়! কি ব্যাপার?

শচীনবাবু কহিলেন, 'এতদিন পরে এসেছে আমার আজি অভিসার রাত্রি'।

—অভিসারে এসেছেন? যাক্ সেকথা, কিন্তু ব্যাপার কি? এত রাত্রে এভাবে আসার হেতুটা কি বলুন দেখি?

শচীনবাবু কহিলেন, সত্যর গচ্ছিত ধন নিয়ে এসেছি। আজ ভোরে আমার বাসা সার্চ্চ হবে। আপনাব এখানে রাখতে হবে।

—কোথায় রাখব?

—সে আমি রাখছি। শচানবাবু গুলি বাহিব করিয়া কাগজে পুরিলেন।

—কোথায?

—বাথরুমে ত টালির ছাদ?

—হ্যাঁ।

—তবে, আলো ধরুন।

মিস্ রায় আলো ধরিলেন। শচীনবাবু রুয়ো ও টালির মাঝে জিনিষগুলি সাবধানে রাখিলেন। নামিয়া আসিয়া বলিলেন, গচ্ছিত ধন, রাখবেন—আর বিশ্বস্ত ব্যক্তি পেলে দেবেন।

—হ্যাঁ, এখন আসুন তাড়াতাড়ি।

চেযারে বসিযা শচীনবাবু বলিলেন, বসুন, একটু জিরিয়ে নি! এত কষ্টে অভিসারে এসেছি—

একটু পরে রহস্য করিলেন, এখন কেউ দেখে ফেললে বেশ মজা হয় না?

—কি আর হবে? বদ্‌নাম ত! তা হতে কি আর বাকী আছে। কিন্তু আমার পক্ষে সুনাম-দুর্নাম সবই এক।

—কেন?

—কেন আবার ? বিয়ের বালাই যখন নেই—

—থাক্—খবর বলুন।

শচীনবাবু আনুপূর্ব্বিক সবই বলিলেন। সত্যর কাহিনী ও তাহাদের বাঁচাইবার জন্য বৌমার সর্পদষ্ট হওয়ার অভিনয়ের কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন। যখন দুই জনেই কথাবার্ত্তায় মশগুল হইয়া উঠিয়াছেন ঠিক সেই সময়ে উপরের টিনের চালের উপর চট্ পট্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল।

—বেশ হ'ল, এখন যাবেন কি করে ?

—না হয় থাকি।

—রাত যে প্রায় তিনটে।

—বৃষ্টিতে আমার যাওয়া আটকাবে একথা ভাবতে পারলেন ?

—হ্যাঁ, তাও ত বটে, আপনাদের গতি যে অপ্রতিহত। যাক্, আপাততঃ চা করি, খান্ তার পরে যা হয় হবে।

—কিসে চা করবেন ?

—ষ্টোভে।

—শব্দ হবে যে !

—না স্পিরিট ল্যাম্প।

চায়ের জল গরম হইতে লাগিল। শচীনবাবু বলিলেন, সত্য বলেছিল সেদিন, আমার একসঙ্গে ধরা পড়লে সে খুব আনন্দিত হ'ত। আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—কেন ?

—কারণ, তাহ'লে কাল সহরে একটা হৈ চৈ পড়ে যাবে, কেমন মুখরোচক আলোচনা চল্‌বে।

—আপনার খুব ভাল লাগবে ?

—কেন নয় ?

—কালই আমি বাসায় গিয়ে বলে আস্‌বো নানা পরিহাসের মাঝে।

জল ফুটিল, মিসেস্‌ রায় চা তৈরী করিলেন···চা খাইতে খাইতে শচীনবাবু বলিলেন, বেশ লাগছে কিন্তু স্থান কাল সবই মনে মোহজাল বিস্তার করবার উপযোগী।

—আপনার লজ্জা করা উচিত ছিল—নিঃসম্পর্কীয়া একজন মহিলার শয়নকক্ষে গভীর রাত্রে ঢুকে—শ্রীমতী রায় হাসিয়া উঠিলেন।

লঘু হাস্য-পরিহাসে চা পান সমাপ্ত হইল। তখন ঝির ঝির করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শ্রীমতী রায় ঘড়ি দেখিয়া বলিলেন, সাড়ে তিন।

—হ্যাঁ উঠি—আর দেখা হবে কি না কে জানে? জেলে যেতেই হবে বোধ হয়।

শচীনবাবু হঠাৎ চুপ করিয়া গেলেন। শ্রীমতী রায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁহাব দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু শচীনবাবু তথাপি কিছু বলিলেন না। অণিমা প্রশ্ন করিলেন, আপনার কি শীঘ্রই জেলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে?

—হাঁ, মনে হচ্ছে অতি সত্বর, নেহাত কিছু না পেলেও পুলিস ছাড়বে না—সত্যর কাছে আমার আংটি পাওয়া গেছে, আমার ভক্ত ছাত্রেরা তা সনাক্ত করেছে, কাজেই—

শচীনবাবু হঠাৎ আবার চুপ করিলেন, একটা চিন্তা তাঁহার মনকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল, মীরা ও খোকার কি হইবে—কেমন করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিবে? যাহারা সাহায্য করিতে পারিত তাহারা আজ কারা-প্রাচীরের অন্তরালে—যাহারা বাহিরে তাহারা নিশ্চিন্তে দিন গুজরান করিতেছে। কতকগুলি কর্ম্মীর গ্রেপ্তারের সুযোগে যাহাদের দোকানের খরিদ্দার বাড়িয়াছে তাহারা নিয়তই কামনা করিতেছে তাহাদের কারাবাসের মেয়াদ দীর্ঘ হোক···শচীনবাবু ভাবিতে লাগিলেন,—তাঁহার আদরের খোকা—মীরা, ইহাদের কি গতি হইবে?

শ্রীমতী রায় বলিলেন, কি ভাবছেন?

—সে কথা বললে আপনি হয়ত আমাকে দুর্ব্বলচিত্ত বলে মনে করবেন।

—না, খোকাদের কথা ত! আমি বেঁচে থাকতে তারা কষ্ট পাবে না, আপনি নিশ্চিন্ত মনে যান। আপনি জয়যুক্ত হোন্।

—জয়-পরাজয়ের কথা জানি না। সত্যর কথাই বলি, একটা কিছু করতে হবে বলে সে কাজে নেমেছে, আমিও নামতে বাধ্য হয়েছি, ওদের দেশপ্রীতি আর আন্তরিকতাকে শ্রদ্ধা করি বলে।

স্থির বিশ্বাসের সুরে অণিমা দেবী কহিলেন, কিন্তু এই ত্যাগ, এই সেবা, ব্যর্থ হতে পারে না, জগতের ইতিহাসে কখনো তা হয় নি।

—হয়ত তাই। অঞ্জলিরা রইল প্রয়োজন হলে তাদের দেখবেন—

—হ্যাঁ জানি।

—জীবনে আর দেখা হবে কিনা কে জানে! তবে আপনাকে ভুলবো না।

—যেখানেই থাকুন, আপনার জন্যে আমার সহানুভূতি চিরকালই থাকবে। কোন এক মহান আদর্শের মূলে তাহাদের আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল। ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। বিদায় মুহূর্ত্তে মনে হইল এ যেন পরমাত্মীয়তা। অণিমার চোখ দুটি আসন্ন বিদায়ের ব্যথায় অশ্রু-আপ্লুত হইয়া উঠিল। তিনি উঠিয়া শচীনবাবুকে প্রণাম করিলেন, তারপর সদর দরজাটি খুলিয়া দিলেন। শচীনবাবু রাস্তায় পড়িয়া একটু আগাইতেই দেখেন রঞ্জন এত রাত্রে ছাতা মাথায় দিয়া রাস্তায় ঘুর ঘুর করিতেছে। শচীনবাবু চমকাইয়া উঠিলেন—তবে ত কিছুই গোপন নাই।

*

বাড়ী যাইয়া শচীনবাবু বোধ হয় একটু ঘুমাইয়াছেন, হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সবে সূর্য্যোদয় হইতেছে—পুলিশে বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে।

খানাতল্লাসী চলিতে লাগিল অতি নির্ম্মমভাবে। বালিশ ছিঁড়িয়া তুলা বাহির করিল, তোশক কাটিয়া দেখিল ; চাল, ডাল, গুড়, তেল মিশাইয়া দেখিল—কিছুই বাদ গেল না। তাহার পরে পরীক্ষার কাগজের ভিতরে বাহির হইল কংগ্রেসের ইস্তাহার—ধ্বংসাত্মক কার্য্যের প্ররোচনা।

শচীনবাবুর হাতে হাতকড়া দিয়া বিজয়গর্ব্বে পুলিসের লোকেরা তাহাকে লইয়া চলিল। রাস্তার দুই পাশে বহু লোক ভিড় জমাইয়াছে। কেহ বিস্ময়ে, কেহ করুণায়, কেহ উল্লাসে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া দেখিতেছে। সাধারণের করুণা বঞ্চিত নিঃস্ব রিক্ত অন্তরে অত্যন্ত নিঃশব্দে নীরব জনতার কৌতুকদৃষ্টির উপর দিয়া শচীনবাবু চলিয়া গেলেন কারাগারের অন্তরালে। শহরে বিজয়মালা দিবার আর কেহ অবশিষ্ট নাই।

শচীনবাবু হিসাব করিয়া দেখিলেন, এখনও তাঁহার বাক্সে ১২।৵০ আছে। পাঠকদা একটি পয়সা রাখিয়া সন্তানকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, 'বেঁচে থাকিস্'। তাহাবা সত্যই বাঁচিয়া ছিল, তিনি সেই তুলনায় তো বিরাট সম্পত্তি রাখিয়া যাইতেছেন বিবেচনা করিয়া যেন হৃষ্ট হইযা উঠিলেন। ভাবিলেন, যে ভগবান অসহায় নিঃসম্বল শিশু দুইটীকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন তিনি অবশ্যই মীরা আর খোকাকে বাঁচাইয়া রাখিবেন। আর যদি নাই রাখেন তবে তাঁহার কি করিবার ক্ষমতা আছে ? তিনি ত নিমিত্তমাত্র !

শচীনবাবু চলিয়া যাইবার পর মীরা ঘরে ঢুকিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিল। কতদিন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া সে এই গৃহকে সাজাইয়াছিল। প্রত্যেকটি দ্রব্যকে অপরিসীম স্নেহ দিয়া সে আপনার করিয়াছে, মুহূর্ত্তে তাহা নষ্ট হইয়া গেল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে। মীরার মনটা অত্যাচারীদের উপর বিদ্রোহে নির্ম্মম হইয়া উঠিল—সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে, এত দম্ভ অত্যাচারের শাস্তি পাইতেই হইবে।

কিন্তু মীরার এ নিষ্ফল ক্রোধ—পরাজিতের অসহায় অভিশাপ মাত্র।

কয়েকদিন পরের কথা।

মিস রায় মাঝে মাঝে আসেন, খোঁজখবর লন। খোকা তাহার সহিত বেশ জমাইয়া লইয়াছে—তাহাকে পিসিমা বলিয়া ডাকে। মাঝে মাঝে সে পিসিমার সহিত বেড়াইতেও যায়। মাঝে মাঝে সে প্রশ্ন করে—বাবা কোথায় ?

মিস রায় বলেন, কলকাতায় বেড়াতে গেছেন শীগগিরই আসবেন।

—কবে আসবে ?

—কাজ শেষ হলেই আসবেন।

সেদিন মীরা ভাত রাঁধিয়া খোকাকে ভাত মাখিয়া দিয়াছিল। খোকা নানারূপ বায়না করিয়া অবশেষে এক গ্রাস মুখে দিতে না দিতেই পুলিস আসিয়া উপস্থিত হইল, মীরাকে নানারূপ প্রশ্ন আরম্ভ করিল। মীরা তাহাদের পানে না তাকাইয়া উত্তর দিল, জানি না।

নানা প্রশ্নের একমাত্র 'জানি না' এই জবাব পাইয়া জনৈক অত্যুৎসাহী পুলিস-কর্ম্মচারী খোকার সামনের ভাতের থালাটা বুটের আঘাতে বাহিরে ফেলিয়া দিল—মীরা খোকার হাত ধরিয়া তাড়াতাড়ি উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। পুলিসপুঙ্গব সদম্ভে ভাতে ভর্ত্তি মাটির হাঁড়িটায় পদাঘাত করিয়া চূর্ণ করিয়া দিল।

মীরা চাহিয়া দেখিল—হঠাৎ চোখ দুইটি তাহার বাঘিনীর হিংস্রতায় ভরিয়া উঠিল, রাগে আক্রোশে ফুলিতে ফুলিতে সে বলিল, আপনারা মানুষ ?

জবাবের অপেক্ষা না করিয়া সে পাশের বাড়ীতে চলিয়া গেল। পুলিস বাড়ী খানাতল্লাস করিয়া চলিয়া গেল।

মীরা আসিয়া দেখে তাহার বাক্স ভাঙ্গা, কানের দুলজোড়া, বিবাহের আংটিটি ও নগদ টাকার কিছুই নাই।

মীরা আর একবার কাঁদিল—একান্ত অসহায়ের মত। যে ভাবনায় মীরা একদিন শিহরিয়া উঠিত কি করিবে, কেমন করিয়া খোকাকে লইয়া থাকিবে, এই অবস্থার সম্মুখীন হইয়া তাহার সে ভাবনা দূর হইয়া গেল। তাহার শুধু মনে হইতে লাগিল এই অত্যাচারের প্রতিবাদ না করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেয়ে মরিয়া যাওয়াই ভাল। ক্রোধে দুঃখে ক্ষোভে সে নাগিনীর মত ফুলিতে লাগিল।

*

শ্যামলী, অঞ্জলি, বৌমা ও মীরা সেদিন একত্র সমবেত হইল। পেট্রোল টীন দুইটি এখনও রহিয়াছে, সেগুলিকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। দুইটি দল—একটি শ্যামলী ও মীরা আর একটি বৌমা ও অঞ্জলি। প্রথম দলের লক্ষ্য মুলি বাঁশের বেড়াঘেরা খড়ের পুলিস ব্যারাক, দ্বিতীয় দলের লক্ষ্য পোষ্টাপিস—সেও অনুরূপ ঘর। কলসী ভরিয়া পেট্রোল লইয়া যাইবার সুবিধা আছে, কারণ উভয় স্থানেই টিউবওয়েল আছে এবং মেয়েরা সন্ধ্যার পরেও সেখানে জল আনিতে যায়।

পোষ্টাপিসের পূব ও দক্ষিণ দিক দিয়া এবং পুলিস ব্যারাকের দক্ষিণ দিয়া বড় রাস্তার পাশের খরস্রোত খালটি প্রবাহিত। আর একটি খালের জলধারা ব্যারাকের পিছনের খানিকটা জঙ্গলের পাশ দিয়া বহিয়া ঐ খালে পড়িয়াছে—উভয়ের মিলিত জলরাশি বড় রাস্তার পুলের নীচে দিয়া যাইয়া একেবারে মাঠে চলিয়া গিয়াছে। সেখান হইতে একটা ছোট রাস্তা বৌমাদের বাড়ীর সন্নিকটে গিয়াছে। ঠিক হইল—কার্য্য সমাধা করিয়া সকলে জলে ঝাঁপ দিবে কলসী লইয়া এবং এক স্থানে মিলিত হইয়া ডাক্তারবাবুর বাড়ীতে গিয়া উঠিবে—আর যদি কার্য্য সুসম্পন্ন নাই হয় তবে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে।

পুলিস-ব্যারাকের সামনেটা কাঁটা তারে ঘেরা, কিন্তু ঐ খালটি থাকায় পিছনটা উন্মুক্ত।

পারিপার্শ্বিক ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হইলে বৌমা মীরাকে কহিল, আপনার আর গিয়ে কাজ নেই, অন্য কিছু না হলেও গ্রেপ্তার অবশ্যম্ভাবী। খোকা রয়েছে, তাকে দেখবার ত কেউ নেই।

মীরা কহিল, খোকার জন্যেই আমাকে যেতে হবে, খোকার ভাতের থালা যারা পা দিয়ে মাড়িয়েচে, তাদের উপর প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। স্বামী-পুত্র নিয়েই মেয়েদের সংসার, যদি তাদেরই এ দশা, তবে আমার বেঁচে থেকে কি ফল?

অঞ্জলি কহিল, তবুও চিন্তা করা দরকার, আমরা ত যাচ্ছি—

মীরা দৃঢ়তার সহিত জানাইল, সে যাইবেই। অত্যাচারে মানুষ এমনি ভাবেই মরিয়া হইয়া উঠে, নহিলে কে ভাবিতে পারিত মীবার মত ভীরু কুলবধূর মনে এমন দুর্জ্জয় সঙ্কল্প আসিয়া দেখা দিবে।

অঞ্জলিরা প্রতিবাদ না করিয়া কহিল, আচ্ছা সে দেখা যাবে। আগে খোঁজখবর নিয়ে দিনক্ষণ ঠিক করা যাক্—

সকলে চলিয়া গেলে মীরা অনেকক্ষণ একাকী বসিয়া রহিল, তাহার মনের আকাশে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা যেন রহিয়া রহিয়া গর্জ্জাইতেছে। খোকার কি হইবে, সে কেমন করিয়া বাঁচিবে, অসহায় শিশু কি করিয়া এই অনুদার পৃথিবীতে আত্মরক্ষা করিবে এ সব চিন্তা সে ক্ষণিকের জন্যও করিল না, সে কেবল ভাবিল—আগুন দিতে হইবে। আগুনে পুড়িয়া উহারা মরুক, যদি নেহাতই বাঁচিয়া যায়—তাহা হইলেও পুড়িয়া মরিতে পারে এই আশঙ্কা যেন উহাদের রাত্রির নিদ্রাকে হরণ করে। এই একমাত্র চিন্তা তাহার মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

মীরা স্থিরসংকল্প হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। খোকা খাটের উপর অঘোরে

ঘুমাইতেছে। মীরা নিদ্রিত পুত্রের কপালে চুম্বন করিয়া কহিল, বেঁচে থাকো—সত্যের মত বীর হও।

*

সেদিন সন্ধ্যার পর এক ফালি চাঁদ উঠিয়াছিল, কিন্তু সঞ্চরমাণ মেঘে তাহা অস্পষ্ট ঘোলাটে হইয়া উঠিয়াছে। রিজিয়াদের বাড়ীর পিছনে তাহারা যখন সমবেত হইল তখন ঈষৎ রাত্রি হইয়াছে—পথে বৈকালিক ভ্রমণার্থীর সংখ্যা ধীরে ধীরে কমিয়া আসিয়াছে…

আজ শ্যামলী, অঞ্জলি ও বৌমা আসিয়াছে দেশপ্রেমের উত্তেজনায় মাতিয়া, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জানাইতে হইবে এই আকাঙ্ক্ষা লইয়া, কিন্তু মীরা আসিয়াছে প্রতিহিংসার অন্ধ উন্মাদনা লইয়া। অল্পশিক্ষিতা গৃহস্থ-ঘরের বধূ, আদর্শের প্রতি অনুরাগ তাহার নাই, কিন্তু তাহার ভিতরের প্রতিহিংসার অগ্নিশিখা প্রচণ্ড বেগে বাহির হইয়া আসিবে। সামনে যাহা পায় তাহাই সে গ্রাস করিবে।

যথাসময়ে রিজিয়া তাহাদের গৃহের পিছনে পেট্রোলের টিন বাহির করিয়া দিল—দুইটা কলসীতে তাহা ভরিয়া উহারা বিভিন্ন পথে রওনা হইল।

পোষ্টাফিসের পিছনে ও পুলিস-ব্যারাকের সাম্‌নের টিউবওয়েলে পাড়ার মেয়েরা সন্ধ্যার সময় যায়, পানীয় জল লইয়া আসে। কাজেই সন্দেহের কিছু ছিল না। মীরার কাঁকালে পেট্রোল ভর্ত্তি কলসী—আজ তাহার এতটুকু ভয় নাই—প্রাণ তাহার যায় যাক্, কিন্তু আগুন দিতেই হইবে। তাহার বুকে আজ দুর্জ্জয় সাহস—একমাত্র ভাবনা খোকাকে লইয়া। সে তাহার পিসির কাছে থাকিবে।

ব্যারাকের সামনের টিউবওয়েলে শ্যামলী তাহার কলসী ভর্ত্তি করিয়া আবার শূন্য করিল। রাস্তায় কদাচিৎ লোকজন যাইতেছে। হঠাৎ

রাস্তাটা যেন জনশূন্য হইয়াছে, মীরা অত দেখে নাই—সে শ্যামলীর ইঙ্গিতে তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া চলিল।

পিছনের অন্ধকারে তাহারা আসিয়া দাঁড়াইল। স্থানটি অল্পস্বল্প জঙ্গলাকীর্ণ, ব্যারাকের ভিতরে কে একজন সেপাই খাটিয়ায় শুইয়া নাকি স্বরে ভজন গাহিতেছে।

শ্যামলী কহিল, আমি পেট্রোল ছিটিয়ে দেই এই ছেঁচা বেড়ার গায়ে। আপনি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ছুঁড়ে দেবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে কলসী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বেন জলে। ওরা গুলি করতে পারে—

—গুলি করবে ?

—হ্যাঁ, ওদের উপর এখন এমনি হুকুমই আছে।

শ্যামলী প্রস্তুত হইয়া পেট্রোল ছিটাইতে যাইবে এমনি সময় একটা হৈ চৈ। সঙ্গে সঙ্গে আর্ত্ত কণ্ঠের চীৎকার—আগুন আগুন—

লোকজনের ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি, চারিদিকে তুমুল কলরব। মীরা সহর্ষে কহিল, পোষ্টাপিসে ওরা লাগিয়েছে তা হলে—

শ্যামলী কহিল, হ্যাঁ—আর দেরি করবেন না, এই অবসর, সব ছুটেছে ওদিক পানে।

ভজনগান-রত লোকটি 'কেয়া কেয়া' করিতে করিতে বাহির হইয়া গিয়াছে। শ্যামলী কলসী হইতে বেড়ার গায়ে পেট্রোল ছিটাইয়া দিল, কলসী নিঃশেষ হইলে কহিল, লাগান বৌদি—

—কিন্তু ওরা যে ঘরে নেই।

—না থাক্ লাগান, পেট্রোলের গন্ধে সব এসে পড়বে।

মীরা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া ফেলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে সমস্ত ঘর অগ্নিময় হইয়া উঠিল, আগুনের লেলিহান শিখা দেখিতে দেখিতে আকাশকে রক্তাভ করিয়া ফেলিল।

শ্যামলী কহিল, আসুন—মুহূর্ত্তে সে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

মীরা অপূর্ব্ব আনন্দে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল—আগুন। ছিটা বেড়া পার হইয়া আগুন খড়ের চাল ধরিয়াছে, একটা বাঁশের গিট সশব্দে ফাটিয়া গেল। পরম উল্লাসে সে মনে মনে বলিল, জ্বলুক, আরো জ্বলুক···অত্যাচার, লুব্ধতা, সব পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাক্, ক্ষমতার ঔদ্ধত্য পুড়িয়া ভস্মীভূত হোক—

মীরা জলে ঝাঁপ দিতে ভুলিয়া গিয়াছে—আগুনের লেলিহান শিখার দিকে চাহিয়া সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। খোকার থালা যাহারা লাথি দিয়া ফেলিয়া দিয়াছে তাহারা পুড়িয়া মরিতেছে। তাহার সঙ্গে পুড়িতেছে অত্যাচার, অবিচার, আর সকল গ্লানি।—মীরা হর্ষে গর্ব্বে সফলতার আত্মপ্রসাদে অভিভূত হইয়া পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়াই রহিল—তাহার কানে আসিতেছে যেন অত্যাচারীর হাহাকার, আর্ত্ত কণ্ঠস্বর, করুণ ক্রন্দন —অগ্নিদগ্ধ নিরুপায়ের ভয়াবহ চীৎকার।

হুম্ করিয়া রাইফেল গর্জ্জিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে মীরা পড়িয়া গেল। কি হইয়াছে সে জানে না—একটা উত্তপ্ত অগ্নিশলাকা যেন অকস্মাৎ তাহার দেহ ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায়—বুকে, পেটে না মাথায় বুঝিতে পারিতেছে না। অসহনীয় যাতনায়, আর্ত্তস্বরে সে ডাকিল, শ্যামলী, খোকা, খোকা—শরীরের কোন একটা স্থান যেন ভিজা —সে হাত দিয়া দেখিল, সারা হাত রক্তে ভিজিয়া গিয়াছে, আগুনের আভায় তাহা ঘোর রক্তবর্ণ দেখা যাইতেছে—তাহারই বুকের রক্ত—হোক, সে প্রতিশোধ লইয়াছে।

মনে মনে সে বলিল, বেঁচে থাকিস খোকা, এই রক্তের প্রতিশোধ নিতে তুই বেঁচে থাকিস।

অত্যন্ত ব্যাকুল আর্ত্তকণ্ঠে সে আর একবার ডাকিল, খোকা—

তাহার পর সে আর কিছু জানে না।

রক্তে তাহার ক্ষীণতনু প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। প্লাবিত হইয়াছে দেশের

মাটি, থোকার দেশের মাটি, ঐ পুলিসের দেশের মাটি। সবুজ ঘাস, পৃথিবীর কঠোর নির্দ্দয় মৃত্তিকা ভিজিয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এই নূতন নয়, যুগে যুগে পৃথিবীর মাটি এমনি ভাবে কতবার রক্তাক্ত হইয়াছে, অগ্নিকুণ্ডে কত মৃত পতঙ্গের ভস্মস্তূপের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে এই সভ্যতা !...

চারিপাশের আগুন নির্ব্বাপিত করিবার জন্য সহস্রাধিক ব্যক্তি সমবেত হইয়া কলরব করিতেছে, কিন্তু যে আগুন জ্বলিয়াছে তাহা নিবাইবার উপায় নাই। খড়ের ঘরের আগুন পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এক নিমেষে, তাহার উত্তাপের নিকটবর্ত্তী হওয়া একেবারেই অসম্ভব, তাই নিরুপায় জনতা নিশ্চেষ্ট ভাবে দাঁড়াইয়া কেবল দেখিতেছে।

কয়েক মুহূর্ত্তেই সমুদয় গৃহ পুড়িয়া ভস্মে পরিণত হইয়া গেল। তাহার কিছুক্ষণ পরেই আসিল জোয়ার, নদীর জলোচ্ছ্বাস প্রবল বেগে খালে পড়িল এবং আশেপাশের সব কিছু ভাসাইয়া অতি দ্রুত মাঠে নামিতে লাগিল।

নির্জ্জন অন্ধকারে খালের জল কলকল করিয়া বহিয়া চলিল নিরুদ্দিষ্ট নিম্নভূমির দিকে। জীবিতকে দিল তৃষ্ণার জল, মৃতকে লইয়া গেল অজ্ঞাত অন্ধকার প্রদেশে।

*

পরদিন প্রত্যূষে শ্যামলী ও অঞ্জলিকে চলিয়া যাইতে হইল কারাগারে। বৌমা দিনের পর দিন অন্তঃপুরে ঘোমটা টানিয়া ঘরকন্নার কাজ করিয়া যাইতে লাগিল, গৃহস্থ-ঘরের নম্র সলজ্জ বধূটির মত। শাশুড়ী জানেন বৌমা তাঁহাদের লক্ষ্মী বৌ—তবে স্নান করিতে গিয়া আংটি হারাইয়াছে এই তাহার একমাত্র ত্রুটি।

মীরার শব পাওয়া যায় নাই—তাহার মৃতদেহের কি গতি হইয়াছে কেহ জানে না—জানিবার প্রয়োজনও কাহার হয় নাই।

*

প্রত্যূষে খোকা ঘুম হইতে উঠিয়া দেখে মা নাই। সকালে খাইতে না দিয়া মা কোথায় গেল? হয়ত ঘাটে—সে ঘাটে গিয়া খুঁজিয়া আসিল—মা সেখানেও নাই।

ঘরে মুড়ির কলসী খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু সব এমন অগোছালো হইয়া রহিয়াছে যে কিছুই পাওয়া গেল না। সে অভিমান-স্ফুরিত অধরে খানিক বসিয়া রহিল,—মা মা বলিয়া ডাকিল, কেহ সাড়া দিল না।

অকস্মাৎ সে চাহিয়া দেখে পিসিমা পাশেই দাঁড়াইয়া। পিসিমা বলিতেছে,—খোকা এদিকে আয়, সন্দেশ খাবি—

খোকা আগাইয়া আসিয়া সানন্দে সন্দেশ খাইয়া লইল। প্রশ্ন করিল, মা কোথায়?

মিস্ রায়ের চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল, তিনি নিবিড় আলিঙ্গনে খোকাকে বুকে চাপিয়া কি বলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না—চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

—মা কোথায়?

—কলকাতা—আস্‌বে। চল তুমি আমার কাছে থাক্‌বে—

—কবে আস্‌বে?

—চিঠি দেবে, তারপরে আসবে।

দপ্তরী ঘরে তালা দিতেছিল, খোকা তাই প্রশ্ন করিল, ঘলে তালা দেয় কেন?

—তুমি আমার কাছে থাকবে যে! কত বই দেব—যাবে?

খোকা কেমন ভ্যাবাচাকা খাইয়া গিয়াছিল, অসহায়ের মত মিস্ রায়ের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, হুঁ।...

সে আজ কি হারাইয়াছে, কেন হারাইয়াছে তাহা জানে না—

পিসিমার পিছনে পিছনে সে উল্লাসের সহিত চলিল। পিসিমা সন্দেশ দিবে বলিয়াছে অতএব আর দুঃখের কি আছে।

তবুও পিছন ফিরিয়া একবার বোধ হয় দেখিল, মা কোথায়। দেখে তাহার বন্দে মাতরম্ উঠানের কোণে পড়িয়া আছে। সে পিসিমার কোল ফেলিয়া তাড়াতাড়ি তাহা কুড়াইয়া লইয়া কহিল, পিসিমা, বন্দে মাতরম্ নিয়ে যাবো—

মিস্ রায় রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, নিয়ে চলো বাবা!

খোকা পতাকা উড়াইয়া চলিল পিসিমার সহিত।

রঞ্জন আর মণিবাবু বলিলেন, খোকার আর এমন কষ্ট কি? মেজমার কাছে ভালই থাকবে—

অনেকে বিদ্রূপের হাসি হাসিল, অনেকে নির্ব্বাক হইয়া রহিল। কেহ 'আহা' বলিয়া সমবেদনা প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহাদের সকলেরই জীবনযাত্রা আগের মতই চলিতে লাগিল একান্ত নিশ্চিন্তে। সত্যদের রক্তরঞ্জিত পথের কথা তাহারা ভুলিয়াছে। মীরার বক্ষরক্তে যে মাটি ভিজিয়া রক্তিম হইয়াছিল তাহার কথাও ভুলিল। খোকার কথাও তাহারা একদিন ভুলিবে। জীবন চলিবে নিষ্ঠুর ঔদাস্যের উপেক্ষায—

*

পৃথিবীর আবর্ত্তন চলিয়াছে আপনার অক্ষকে পরিক্রমা করিয়া একই ভাবে, একই নিয়মে, দিন-রাত্রি, শীত-গ্রীষ্ম, মাস-বর্ষ সৃষ্টি করিয়া। মানুষ জন্মিতেছে, মরিতেছে, বাড়িতেছে—

তাহার মাঝে একটি বিশেষ চিহ্নিত দিন ১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ।

শচীনবাবু এই বিশেষ দিনটির কয়েক মাস পূর্ব্বে জেল হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সত্য, ধনা প্রভৃতিও ছাড়া পাইয়াছিল, অঞ্জলি, শ্যামলী অনেক আগেই মুক্তি পাইয়াছে। শচীনবাবু মীরার মৃত্যুসংবাদ জেলেই

পাইয়াছিলেন। প্রথমে চোখের জল ফেলিয়াছিলেন, পরে ভাবিয়া বিস্মিত হইতেন অত্যন্ত ভীরু লজ্জাশীলা মীরা এমনি করিয়া জীবনাহুতি দিবাব সাহস কোথা হইতে কেমন করিয়া পাইল। অত্যাচার ও লাঞ্ছনাই যে তাহার সুপ্ত শক্তিকে জাগাইয়াছিল তাহা বুঝিতে তাঁহার বাকী রহিল না।

মিস্ রায় নানারূপ অশান্তি ভোগ করিয়া কপালে কলঙ্কের টীকা পরিয়া স্থানান্তরে চাকুরি লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। খোকা তাহার এক দূরসম্পর্কীয়া মাসীর বাড়ীতে কয়েকটি বৎসর অত্যন্ত অসহায়ের মত কাটাইয়া দিয়াছে। শচীনবাবু আসিয়াই তাহাকে লইয়া আসিয়াছেন। এখন তিনি সপুত্র স্কুল-বোর্ডিঙে থাকেন। বাসায় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই অর্থাৎ তখন তিনি নিঃসম্বল।

কলিকাতা নোয়াখালিব তাণ্ডবান্তে শহরে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করিতেছে। যে-কোন সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধিতে পারে, এই আশঙ্কা সকলেব মনকে উদ্বেগে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। শচীনবাবু কিভাবে নিজ সম্প্রদায়েব লোকেদের বাঁচানো যায় তাহারই উপায় নির্দ্ধারণে ব্যস্ত ছিলেন। ঠিক এমনি সময় স্বাধীনতা দিবস ঘোষিত হইল, চারিপাশে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

১৫ই আগষ্ট। কলিকাতা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে মুখরিত, নরনারী আনন্দে উৎফুল্ল, বাসে ও ট্রামের মাথায় চলিতেছে লোকেদের তাণ্ডব নৃত্য—কত লোক আনন্দে সংজ্ঞাহীন হইতেছে সেই দিনের কথা।

ওদিকে পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পূর্ব্ব-পাকিস্থানের মফঃস্বল শহরেও আনন্দের সাড়া পড়িযাছে। স্কুলের ময়দানে জনসভা হইবে—পাকিস্থানের পতাকা উত্তোলনের পরে সুরু হইবে পতাকা-অভিবাদন ও বক্তৃতার পালা। কংগ্রেসনেতা শচীনবাবুকে পতাকা উত্তোলনে উপস্থিত থাকিবার অনুরোধ তথা আদেশ দেওয়া হইয়াছে, সত্যও থাকিবে। শচীনবাবু বক্তৃতা

করিবেন। সত্যকেও কিছু বলিতে হইবে। এর আসল তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, তাহাদিগকে পাকিস্থানের প্রতি প্রকাশ্যে আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে।

মাঠে লোক-সমাগম হইয়াছে প্রচুর, এত লোক বহুদিন এখানে একত্র সমাবেশ হয় নাই। খোকা বাবার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে এখন বড় হইয়াছে, সে বুঝিতে পারিয়াছে তাহার মা মারা গিযাছেন; বন্দেমাতরম্ আসলে কি তাহাও সে কিছু কিছু বুঝে। তাহাব বয়স আট—আগেকার সেই সুন্দর ফুটফুটে চেহারা আর নাই, অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে।

শচীনবাবু প্রথমে আপত্তি করিযাছিলেন, সত্যও আপত্তি জানাইয়াছিল, কিন্তু লীগের কর্ত্তৃপক্ষেব যুক্তি অন্যরূপ। কংগ্রেস-নেতাগণই লীগবিবোধী, তাঁরা যদি আজ সভায় অকুণ্ঠ আনুগত্য স্বীকার না কবেন তবে তাঁরা দেশদ্রোহী প্রমাণিত হইবেন এবং দেশদ্রোহীব শাস্তি যে অনিবার্য্য তাহা না বলিলেও বুঝা কঠিন নয়। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এড়াইবাব জন্য তাঁহাবা শেষ পর্য্যন্ত রাজী হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তব তাঁহাদের বাব বার বিমুখ হইয়া উঠিতেছিল—এই জন্যই কি তাঁহারা এত কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছেন। এইজন্যই কি মীরা মরিয়াছে? মাতৃহারা খোকা কি বাঁচিযা আছে এই আনুগত্যের জন্য। মীরাব বুকেব রক্তে মৃত্তিকা রঞ্জিত হইয়াছিল কি এইজন্যই!

বিরাট জনসভা।

হাজার হাজার লোক সমবেত হইয়াছে পাকিস্থানের স্বাধীনতা-উৎসবে। মোগল রাজসভায় বন্দী বান্দার মত এক পাশে দাঁড়াইয়া আছেন সেই বীরবৃন্দ, অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন একদা যাঁহাদের হৃদয় উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাঁহাদের অন্তর ফাটিয়া যাইতেছে পরাজয়ের বেদনায়, মুখে আনুগত্য স্বীকারের কৃত্রিম হাসি দিয়া তাহা ঢাকিবার একটা নিষ্ফল প্রয়াস তাঁহাদের অবস্থাকে অধিকতর শোচনীয় করিয়া

তুলিয়াছে। কেহ কেহ তাহা লইয়া ব্যঙ্গ করিতেছে। কি আর করবেন, দেশে যখন থাকতে হবে!

শচীনবাবুকে পতাকার নীচে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে মঞ্চ বাঁধা হইয়াছে। সত্য তাঁহার পাশে পাশে চলিযাছে। আজ উহাদের বড় প্রয়োজন শচীনবাবু ও সত্যকে দিয়া বক্তৃতা করানো, কারণ তাহারই মাঝে পরিতৃপ্ত হইবে তাহাদের নিষ্ঠুর অন্তদাব বিজয়োল্লাস।

হাজার হাজার কণ্ঠে জিগীর উঠিল—পাকিস্থান জিন্দাবাদ। সকলে সমবেতকণ্ঠে আনুগত্য স্বীকার করিল।

শচীনবাবু বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন—ভাইসব, আজ বড় শুভদিন ·· কিন্তু তাঁহার অন্তর বেদনায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, কণ্ঠ তাঁহাব রুদ্ধ হইয়া গেল, তিনি বেশী কিছু বলিতে পাবিলেন না—বার বার মনে হইতেছিল মীবা কেমন করিয়া খোকাকে ফেলিয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া উত্তপ্ত সীসক-গোলক তাহার কোমল বুক ভেদ করিয়া গিয়াছিল, উষ্ণ রক্তে পৃথিবী আর্দ্র হইয়া উঠিযাছিল। সে গুলিবিদ্ধ দেহ কেহ দেখে নাই, তাহার কোনো সন্ধান কেহ পায় নাই—সেই শবদেহকে কেহ বিজয়মাল্য ভূষিত করে নাই।

শচীনবাবু অতি কষ্টে হৃদযাবেগ সংযত করিযা কোনোমতে বক্তৃতা শেষ করিয়া কহিলেন, আর একবার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত কণ্ঠে ধ্বনিত হউক—পাকিস্থান জিন্দাবাদ। সঙ্গে সঙ্গে হাজার কণ্ঠে প্রতিধ্বনি হইল।

এই সময়ে মঞ্চের এক প্রান্তে একটা সোরগোল উঠিল, শিশুকণ্ঠে ধ্বনিত হইল "বন্দেমাতরম্" এবং তার পরক্ষণেই একটা আর্ত্ত কণ্ঠের চীৎকার শচীনবাবুর কানে আসিয়া পৌছিল। কণ্ঠস্বর পরিচিত যেন খোকার—

তিনি ছুটিয়া গেলেন সেখানে। দেখেন মঞ্চের নিম্নে খোকা পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিতেছে, কয়েকজন যুবক তাহাকে ধরিয়া উঠাইতে চেষ্টা

করিতেছে, কিন্তু সে কেবল চীৎকার করিতেছে—বাবা! বাবা! শচীন-বাবু ছুটিয়া গেলেন, খোকাকে তুলিয়া দেখেন তাহার বামহাতের কনুইয়ের যেন হাড় সরিয়া গিয়াছে। সত্যও আসিল, তাঁহারা দুই জনে খোকাকে লইয়া ভিড়ের বাহিরে আসিলেন। তখন একজন স্থানীয় মৌলবী উদ্দীপনা-ময়ী ভাষায় ইস্‌লাম ও পাকিস্থানের মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছেন।

শচীনবাবু আহত পুত্রকে কোলে কবিয়া চলিয়াছেন নির্ব্বাকভাবে। সত্য পিছু পিছু চলিয়াছে।

—কে ওকে ফেলে দিলে সত্য!

সত্য মাটির দিকে চাহিয়া বলিল, ও পাকিস্থানের শ্লোগান না বলে বন্দেমাতরম্ বলেছিল বলে কোন অত্যুৎসাহী যুবক ওকে ধাক্কা মারে। তার পর পড়ে গিয়ে—

নীরবে দুই জনে আরও কিছুক্ষণ চলিলেন। ভাবিতে ভাবিতে শচীন-বাবুর হৃদয় বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি অকস্মাৎ বলিয়া উঠিলেন, ওর মা চলে গেছেন, আর আমি বেঁচে রইলুম কি এই দেখতে?

শচীনবাবু সত্যর পানে চাহিলেন। সত্য নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া আছে মাটির দিকে। সে অপরাধীর মত বলিল, নলিনীবাবুকে ডেকে আন্‌ছি আমি। হয়ত হাত মচকে গেছে—

সত্য উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল।

*

খোকার হাতটা ক্রমশঃ সারিয়া উঠিল বটে, কিন্তু একটু বাঁকা হইযা রহিল। স্কুলের পরে শচীনবাবু হোষ্টেলের বারান্দায় বসিয়াছিলেন, সত্য আসিয়া প্রণাম করিল। শচীনবাবু বলিলেন, বসো। খোকার হাতটা একটু বাঁকা হয়েই রইল—আমাদের আনুগত্যের চিহ্নস্বরূপ!

—আপনি রিজাইন দিয়েছেন শুন্‌লাম।

—হ্যাঁ।

—তারপর কি করবেন ?

—প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেলেই চলে যাব দেশে, সেখানকার জমি বিক্রী করে যদি কিছু পাই পেলাম, না পাই ওই নিয়েই চলে যাব পশ্চিম-বাংলায়। সেখানে গেলে তবু একটা সান্ত্বনা পাব যে, স্বাধীন ভাবতে বাস করছি—যে স্বাধীনতার জন্যে ওর মা প্রাণ দিয়েছেন ··

—সেখানে কত লোক গেছে, যাবে। সেখানে গিয়ে কি বাড়ীঘর, চাকরি-বাকরি পাবেন ? কংগ্রেস যেতে বারণ করেছে। এত আশ্রয়প্রার্থীর জায়গা সেখানে হবে না।

শচীনবাবু উদাসভাবে খানিকক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, কংগ্রেসের সহানুভূতি, চাকরী বা বাড়ীঘরের আশায় যাচ্ছি না। যদি নেহাৎ মরতে হয় তা হলে খোকার মা যে পতাকার মর্য্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে, সেই পতাকা যেখানে উড্ডীন সেখানেই মরতে চাই। নিত্য এই পরাজয়ের গ্লানি, এই অসম্মান, এই ভয় নিয়ে বাঁচা চলে না, এমনি জীবন বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়। তা ছাড়া ভাবছি খোকার কথা—সে বড় হয়ে যখন জানবে সব ইতিহাস, তখন এই স্থানের আবহাওয়া তাব জীবনকে দুঃসহ করে তুলবে··

সত্য চুপ করিয়া রহিল। শচীনবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া কোন তর্ক করিতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে কহিল, আমাদের এই অন্তর নিয়ে—যারা এক দিন সত্যই ভালবেসেছিল ··

শচীনবাবু তাহার কথা শেষ করিতে না দিয়াই অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন, কেন ? তুমি যাবে না ?

—যাব, আর একটু দেখে যেতে চাই।

—এ কেবল আরম্ভ, এখন এই লাঞ্ছনা উত্তরোত্তর বাড়বে। যারা এই অবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে চলতে পারবে তারা থাকবে—সব দেশেই

এমন লোকের অভাব নেই যারা সকল অবস্থার সঙ্গেই নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে পারে, যাদের সহনশীলতা অপরিসীম। কাজেই সকলে যাবে না। যারা এক দিন দেশের জন্যে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তাদের মধ্যে অনেকেই আবার নাম-যশ-অর্থ-প্রতিপত্তির মোহে নিজেদের আদর্শকে বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হবে না। ঐ শ্রেণীর লোকের স্বভাব এই। ইতিহাসে দেখা যায়, যুগে যুগে এক দল লোক নিজেদের দেহের রক্তে পৃথিবীর বুক সিক্ত করে দিয়ে যায় আর এক দল লোকের জন্যে—তারা সেই রক্তপুষ্ট উর্ব্বর ধরিত্রীর বক্ষ থেকে ক্ষরিত অমৃত পান করে। তোমরা প্রথমোক্ত দলের, সত্য—পতঙ্গধর্ম্মী; আগুন দেখলে ঝাঁপিয়ে পড়বে, কিন্তু যারা বুদ্ধিমান্ তারা তোমাদের পুড়তে উৎসাহ দিয়ে পেছনে থাকবে ফলভোগ করতে। এটাই জগতের ইতিহাসের ধারা।

শচীনবাবু গভীর অভিমানে চুপ করিলেন। হঠাৎ যেন তিনি বুঝিতে পারিলেন, আপনার খেয়ালে তিনি অপ্রাসঙ্গিক কতকগুলি কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন। সত্য চিন্তা করিতেছিল—শচীনবাবু কি বলিলেন, তাঁহার কথাগুলির আসল তাৎপর্য্য কি?

খোকা সাম্‌নের উঠানে লাট্টু ঘুরাইতেছিল। সত্য অনেকক্ষণ সেদিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, একটা কথা বলব স্যার!

—বল।

—আপনাকে কোন কথা বলতে আজকাল যেন ভয় হয়।

—কেন?

—জানি না, তবে হয়। আপনি এমন ভাবে কথা বলেন যার উপর তর্ক চলে না। আপনার দুঃখ কথাটা অসমাপ্ত রাখিয়াই সে থামিল।

শচীনবাবু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ভয় কি বল?

—আপনার মত শিক্ষিত লোক—যাঁরা এখানকার হিন্দুদের আশাভরসা, তাঁরা যদি এখান থেকে চলে যান তবে অশিক্ষিত হিন্দুজনসাধারণ তো

একান্ত নিরুপায় হয়ে ভবিষ্যতে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করতে বাধ্য হতে পারে। এমনি ভাবে তো এখানে হিন্দুর সত্তাই লোপ পেয়ে যেতে পারে।

শচীনবাবু বলিলেন, ওটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। যেদিন তোমরা না খেয়ে, রোগে ভুগে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের আহ্বান করেছিলে সেদিন ত তারাই তোমাদের ধরিয়ে দিতে গিয়েছে। তারা তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লীগের সঙ্গে মিতালি করেছিল সেদিন একথাই তারা বলেছিল কংগ্রেস বর্ণ-হিন্দু প্রধান। বর্ণ-হিন্দুর অত্যাচার ও ঘৃণা সহ্য করা অপেক্ষা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ শ্রেয়! তবে আজ তাদের কথা চিন্তা করে কি লাভ হবে। ব্রাহ্মণে চণ্ডালের অন্ন খেয়েও তার প্রীতি পায় নি, সহানুভূতি পায় নি। তার অন্তরকে জাগাতে পারে নি।

—সে জন্যে দাযী তাদেব শিক্ষার অভাব ও স্বার্থান্বেষীর প্ররোচনা। তাবা ত দায়ী নয়।

—না জেনে বিষ খেলেও তার প্রতিক্রিয়া হয়। অজ্ঞতার জন্যে বিষের ক্রিয়া বন্ধ থাকে না।

—এটা অভিমানের কথা স্যার, যুক্তির কথা নয়।

শচীনবাবু উত্তেজিত কণ্ঠে কহিলেন, হয়ত নয়, তবে তাদের প্রীতি ও ভালবাসা লাভ কবার জন্যে অপেক্ষা করার সময় আমার নেই। সে ধৈর্য্যও নেই। আমার বযস হযেছে, খোকাকে আমি উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে চাই। তোমরা অপেক্ষা কর, চেষ্টা কর। তরুণ মনের উদারতা নিয়ে আর একবার চেষ্টা কর।

শচীনবাবু অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁকে শান্ত করিবার অভিপ্রায়ে সত্য বলিল, তা হলে আপনি যাচ্ছেন স্যার?

—হ্যাঁ, যথাসম্ভব শীঘ্রই যাব। তোমরাও যাবে, তবে কিছুদিন পরে। এখানে যখন মনে প্রাণে আনুগত্য স্বীকার করতে পারবে না, এদেশকে নিজের বলে ভাবতে পারবে না, তখন যাবে।

—যেখানেই যান, চিঠিপত্র দেবেন স্যার। দিদি কলকাতাতেই আছে। সেখানে তার সঙ্গে দেখা করতে একবার যাব।

শচীনবাবু বলিলেন, তোমার সে গচ্ছিত জিনিষটা তার কাছেই ছিল, তারপর কি হয়েছে জানি না—

—আমি জানি। ফেরত পেয়েছি—আপনি চিন্তিত হবেন না। সত্য প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

শচীনবাবু দূরের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন। সাণ্ডে-ক্লাব আজও আছে, কিন্তু বৈঠক নিয়মিত বসে না, শচীনবাবু ক্লাবের উদ্দেশ্যেই রওনা হইবেন কিনা ভাবিতেছিলেন।

*

শচীনবাবু চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া দেশে আসিলেন।

প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের শ' পাঁচেক টাকা মাত্র সম্বল, তাহার উপর বেশী দিন নির্ভর করা চলে না। মহকুমা শহর হইতে মাইল চৌদ্দ দূরে তাঁহাদের বাড়ী; পৈতৃক বাড়ী ও জমিজমার তিনি কয়েক আনা অংশীদার—তাহাতে তাঁহার বিঘা দশেক জমি ও দালানের একটা কোঠা ছিল, আর একখানা টিনের ঘর তিনিই তুলিয়াছিলেন; পূজা ও গ্রীষ্মের বন্ধে আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন। বাল্যকালে এই বাড়ীর প্রাঙ্গণের ধূলা গায়ে মাখিয়া তিনি বড় হইয়াছিলেন, উঠানের এক প্রান্তে তাঁহারই মায়ের স্বহস্তে রোপিত একটা নারিকেল গাছে সবে ফল ধরিয়াছে। বাল্য-কৈশোর-যৌবনের শত স্মৃতিবিজড়িত এই বাস্তুভিটা,—এই পৈতৃক ভিটার উঠানেই নবোঢ়া মীরা তাঁহার পাশে প্রথম দাঁড়াইয়া গুরুজনদের আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিল। উহারই এক কোণে তাঁহার পিতার মৃতদেহের পাশে গঙ্গাজলি হইয়াছিল, এমনি কত স্মৃতি মনের মাঝে ভিড় করিয়া আসিতে-ছিল। তাঁহার মনে অতীতের শত স্মৃতি যেন জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে

জড়াইয়া ধরিল। এখানে তাঁহার মা বসিতেন, ওখানে বসিয়া মীরা কুটনা কুটিত, ওখানে বসিয়া তিনি খোকার ভাতের মন্ত্র পড়িয়াছিলেন। পিতৃ-পিতামহের পদরেণুকণাপূত এই বাস্তুভিটাকে পরিত্যাগ করিয়া চিরদিনের মত চলিয়া যাইতে হইবে—একথা ভাবিতেই যেন তাহার অন্তর হাহাকার করিয়া উঠিত—বার বার বলিতেন, বিধাতা কোন্ পাপে এমনি করিয়া সুখের স্বর্গলোক হইতে আমায় বঞ্চিত করিলে। ইহার প্রতি ধূলিকণা, ইহার প্রতি বৃক্ষ, পত্র, সব যেন তাঁহার একান্ত আপনার—এ সব ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন ? কোথায়—

যে অভিমান ও জ্বালা লইয়া শচীনবাবু আসিয়াছিলেন তাহা যেন ধীরে ধীরে মন্দীভূত হইয়া আসিতেছিল। মাঝে মাঝে মনে হইত, না হয় নাই গেলাম, আমার জীবনটা না হয় এখানকার ধূলিকণায়ই এক দিন মিশিয়া যাইবে, তাহার পর খোকা যেন তাহার যেখানে খুশি সেখানে আপনার ঘর বাঁধে।

মায়ের রোপিত বৃক্ষ, পিতার স্বহস্তনির্ম্মিত আসবাবপত্র, মীরার তৈরি রান্নাঘরের মৃত্তিকার জলপিঁড়ি সবকিছু একসঙ্গে যেন তাঁহার মনকে দুর্ব্বার ভাবে আকর্ষণ করিতে লাগিল। এই একান্ত আপনার গৃহ ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন, কোন্ সুদূরে ? সে যেন মৃত্যুর পরপারের অজ্ঞাত দেশ, একান্তই অপরিচিত—প্রেমপ্রীতি নৈকট্যহীন—

*

মীরার মৃত্যু-সংবাদ গ্রামে নানা মুখে নানা রূপে পল্লবিত হইয়া রটিয়াছিল। কেহ বলিত, মীরা লড়াই করিয়া মরিয়াছে, কেহ বলিত, সে পুলিশের গুলিতে মরিয়াছে, কেহ অন্যরূপ।

গ্রামের লোকজন শচীনবাবুকে বুদ্ধিমান ও বিবেচক বলিয়া মনে করিত। তাহারা দুই-চারিজন ব্যাকুল ভাবে শচীনবাবুকে প্রশ্ন করিল, বল ত শচীন,

কি করি? দেশে কি থাকা যাবে? এতদিনের বাস্তুভিটা কি ত্যাগ করতে হবে!

বৃদ্ধ তারিণী চট্টোপাধ্যায় প্রশ্ন করিলেন, এই বুড়ো বয়সে কোথায় যাব শচীন? সামান্য দু-এক ঘর যজমান ও দু-চার বিঘে খামার এই নিয়ে কোনমতে আছি। এখন কি করব?

শচীনবাবু নীরব। এ সব প্রশ্নের উত্তর নাই। তার উত্তর নিহিত আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। এই সব প্রশ্নের উত্তরে শচীনবাবু তাই নীরবই রহিলেন।

একজন প্রশ্ন করিলেন, এরা কি কেবল অত্যাচারই করবে। এত দিনের প্রেমপ্রীতি, বিশ্বাসের কোন মূল্য দেবে না। যে সব হিন্দু-পরিবারের গৃহিণীদের মা বলে ডাকে তাদেরও অপমান করবে।

এই সব কাতরোক্তির পিছনে রহিয়াছে বাস্তুভিটা আঁকড়াইয়া থাকিবার একটা আকুল আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যক্ষ বাস্তবকে অস্বীকার করিয়া ভাবপ্রবণ অন্তর অপ্রত্যক্ষ আশার উপব নির্ভব করিতে চাহিতেছে।

তারিণী খুড়ো কহিলেন, যে সমস্ত ছোকরা মুখ তুলে কথা বলে নি, বলতে সাহস পায় নি—ফ'টে, গোদো, ছামাদ সর্দ্দার, লম্বা আহাদ—তারা ভটচায্যিদের পুকুরঘাটে বসে শুনিয়ে শুনিয়ে নাম ধরে ধরে বলে, অমুককে বিয়ে করব, অমুকের বৌকে নিকে করব। স্বকর্ণে এ সব কথা শুনে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু মুখ বুজে থাক্‌তে হয়, প্রতিবাদের সাহস নেই। তারা বলে···

তারিণী খুড়ো কি বলিতে যাইয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিলেন। প্রসঙ্গটা একান্ত বেদনাদায়ক। তাঁহার কুমারী কন্যা বাসন্তীসুন্দরী সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, কিন্তু অর্থাভাবে পাত্রস্থ করা সম্ভব হয় নাই। তাহাকে উহারা জোর করিয়া লইয়া যাইবে এইরূপ একটা ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যাইতেছে। তারিণী খুড়ো তাই সর্ব্বদা সচকিত আতঙ্কে কালাতিপাত করিতেছেন।

শুনিয়া শচীনবাবু ব্যথিত হইলেন, কিন্তু করিবার কিছু নাই। পুলিসে সংবাদ দিয়া লাভ নাই, বিপরীত ফল হইতে পারে। যাহা ঘটিত না তাহাই হয়ত ঘটিবে।

শচীনবাবু বলিলেন, আমার মনে হয় সংসারে দুই রকমের লোক আছে। একদল যারা বেঁচে থাকাটাকেই বড় মনে করে, তার জন্যে সম্মান আত্মমর্য্যাদা বিবেকবুদ্ধি বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠা বোধ করে না, আর এক শ্রেণীর লোক আছে যারা নিজের, সমাজের ও দেশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্যে জীবন বিসর্জ্জন দেয়। যাবা প্রথম শ্রেণীব তারা যাবে না, যারা দ্বিতীয় শ্রেণীর তারা যাবে। বেঁচে থাকতে নয়, মরতেই। কিন্তু ভাবছি এত লোকের ব্যবস্থা কে করবে, তা ছাড়া সেখানে চোরাকারবারী আর সুবিধা-বাদীরা নিজেদের স্বার্থের জন্যে ওৎ পেতে বসে আছে।

--তুমি কি যাবে?

-হ্যাঁ, যাবই স্থির করেছি, এই গ্লানি ও অসম্মানেব মাঝে বাস করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া আমার কি আছে? কোন্ আকর্ষণে থাক্‌ব?

—তারিণী খুড়ো বলিলেন, তোমার কি শচীন, বিদ্যেবুদ্ধি আছে, যেখানেই যাবে ভগবানের কৃপায় অন্নবস্ত্রের সংস্থান করে নিতে পারবে, কিন্তু আমরা—

—একই কথা খুড়ো, সেখানে আমার মত বিদ্বান্ লাখো লাখো আছে। যাবেও অনেকে। কাজেই সমস্যার কোনও সমাধান হবে বলে মনে হয় না। তবে--না বাঁচতে পারি মরব তাতে আমার দুঃখ নেই।

আলোচনা চলে, কিন্তু কিছুই মীমাংসা হয় না। আলোচনা সমস্যার জটিলতা সম্বন্ধে তাঁদের অধিকতর সচেতন করিয়া তোলে মাত্র। সকলেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে নিজ নিজ বাড়ীর দিকে রওনা হন।

*

জমির খরিদ্দার সংগ্রহের চেষ্টায় সে দিন শচীনবাবু বৈকালে বাহির হইলেন। হিন্দু খরিদ্দার নাই, মুসলমান ছাড়া কেহই জমি কিনিবে না। পরিচিত দুই-চার জন মুসলমান মাতব্বরের কাছে কথাটা প্রকাশ করিলে হয়ত ক্রেতা জুটিতে পারে।

কিন্তু পথে যাইতে যাইতে একটা ঘটনায় তাঁহাকে থামিতে হইল। ভট্টাচার্য্যরা পুরাতন বর্দ্ধিষ্ণু ঘর, গ্রামের সকলেই তাঁহাদিগকে ভয়ভক্তি করিয়া চলে; সেটা তাঁহাদের অর্থের জন্যই নয়, তাঁহারা পরোপকারী ও একমাত্র তাঁহাদেরই চেষ্টায় ও অর্থে গ্রামে যাহা কিছু জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে সেইটাই প্রধানতম কারণ।

কে একজন নিষেধ না মানিয়া তাঁহাদের পুকুরে ছিপ ফেলিযা বসিয়া আছে, প্রতিবাদ গ্রাহ্য করে নাই। ফলে একটা বচসা চলিতেছিল।

—তুমি জোর করে দিনদুপুরে মাছ ধরে নিয়ে যাবে?

মুসলমান যুবকটি হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে না, জোর করব কেন? এত দিন আপনারাই ত সব ভাল মন্দ খেয়েছেন, এখন পাকিস্থান হযেছে আমরাও একটু খেয়ে নি। এর মধ্যে জোরজবরদস্তির তো কিছুই নেই।

সে নির্ব্বিকার চিত্তে ছিপ তুলিয়া টোপ পাল্টাইয়া ধীরে সুস্থে পুনরায় মৎস্যশিকারে মনোনিবেশ করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, দেখ শচীন কথার ছিরি, এদের জন্যে ইস্কুল হাসপাতাল করেছি আমরা।

শচীনবাবু কহিলেন, পাকিস্থান হয়েছে তার মানে কি এই যে, হিন্দুর সব কেড়ে নেওয়া যায়। স্বাধীন হওয়ার অর্থ কি তাই?

—আজ্ঞে না, তবে ধরুন আপনাদের খেয়েই ত আমরা আছি। আপনাদের খেয়েই থাকব। দু'একটা মাছ ধরলে আর আপনাদের কি ক্ষতি?

—সকলেই যে ধরতে চাইবে।

—আজ্ঞে তাই ঠিক হয়েছে, কাল জাল নিয়ে সকলেই আসবে, আমি একটু আগেই এসেছি।

—তা হলে মোদ্দা কথা তুমি উঠবে না, মাছ ধরবেই।

—উঠব বৈ কি মাছ পেলেই উঠব।

শচীনবাবু বুঝিলেন বাদানুবাদে লাভ নেই। যুবকটির কথা বলিবার ভঙ্গীতে ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্য সুপরিস্ফুট। তিনি কহিলেন, এখানে বাস করতে হলে এ ধরণের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, সেদিন কথা নেই, বার্ত্তা নেই—দেখি দু'জন নারিকেল গাছে উঠেছে, জিজ্ঞাসা করলে ঠিক এমনি জবাব দিলে। এখন আপনাদেরই ত খাবো—অর্থাৎ এখন ওরা ইচ্ছামত আমার তোমার সবকিছুই খাবে, নেবে, এতে প্রতিবাদ করা চলবে না।

শচীনবাবু কহিলেন, তাই ত দেখছি।

তিনি ফিরিয়া আসিলেন, আজিকার ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার অন্তরে আর কোনরূপ দ্বিধা রহিল না। যত শীঘ্র সম্ভব এই স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত।

ও ছেলেটিকে তিনি জানেন। ও প্রাইমারী পাস করিয়া কয়েক বৎসর মাদ্রাসায় পড়িয়া মৌলবী হইয়াছে। উগ্র সাম্প্রদায়িকতার ভেদ-বুদ্ধিতে কলুষিত ওর মন।

শচীনবাবুর মনে নানা চিন্তার উদ্রেক হইল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন —সকল দেশেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রহিয়াছে। কিন্তু তাদের অবস্থা এত শোচনীয় নয়। কিন্তু এদের মধ্যে অধিকাংশই অশিক্ষিত জনসাধারণ। এদের বিশ্বাস করা চলে না। এদের ভালমন্দ বিচার-শক্তি নাই। তাহাদের উগ্র প্রবৃত্তি কখন যে উৎকট উল্লাসে জাগিয়া উঠিয়া চরম সর্ব্বনাশ সাধন করিবে তাহার ঠিক নাই। এই অনিশ্চয়তা, এই অসম্মানের মাঝে মানুষ বাস করিতে পারে না।

ঘটনাটা হয় ত সামান্য, কিন্তু তাহা বাস্তুভিটার প্রতি শচীনবাবুর আসক্তিকে দূর করিয়া দিল। তিনি পূর্ণোদ্যমে বাস্তু ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

*

শচীনবাবু কিছু জমি বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন জলের দরে। বিঘা প্রতি দর হয় ত ছয় শত, তিনি তাহা তিন শত টাকায় দিয়া দিলেন। অর্দ্ধেক জমি বিক্রয় করিয়া কোনরূপে বার শত টাকা সংগ্রহ করিলেন। পাড়ার সকলে হা হা করিয়া উঠিল। মাটি-ই সোনা, সোনা চুরি যায়, কিন্তু এ কখনো চুরিও হয় না, জলে ডোবে না, আগুনে পোড়ে না, তাকেই তুমি এমনি করে নষ্ট করছ ?

তারিণী খুড়ো একদিন কহিলেন, তোমার বাবা পেটে গামছা বেঁধে এই ক' বিঘা জমি করেছিল। সে চলে গেছে, তাকে এ দৃশ্য দেখতে হ'ল না। কিন্তু আমি যে সহ্য করতে পারছি না। তোমার বাবার সে কি টান, কি ভালবাসা ছিল এই জমিব উপর। বৃদ্ধ তারিণী খুড়ো অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন।

শচীনবাবুর হৃদয়ের কোমলতম স্থানে বার বার আঘাত করিয়া তাঁহার মনকে এঁরাই দুর্ব্বল করিয়া দিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, ইচ্ছা করে ত করছি না, কিন্তু এর মাঝে কেমন করে থাকি ?

বাকী জমির খরিদ্দার স্থির হইয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ তাহারা সকলেই জমি কিনিতে অস্বীকার করিল। কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখা গেল মৌলবী মাতব্বরগণ প্রচার করিয়াছেন যে, হিন্দুরা চলিয়া গেলে জমি বিনা পয়সায়ই পাওয়া যাইবে—অতএব টাকা দিয়া কেনা নিরর্থক। তাহার কথায় মুসলমানেরা বিনা মূল্যে ভূমিলাভ করিবার আশায় উদগ্রীব হইয়া হিন্দুদের প্রস্থানের অপেক্ষায় আছে।

শচীনবাবু অতঃপর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ে তৎপর হইলেন। ঘটি বাটি পিঁড়ি খাট পালঙ্ক আলমারী চেয়ার টেবিল—পুরুষানুক্রমে বাড়ীতে কত জিনিষই না সঞ্চিত হইয়াছে! তিনি টিনের ঘরখানিও বিক্রয় করিয়া দিলেন।

এমনি করিয়া আরও কিছু অর্থ সংগ্রহ হইল।

*

একটু ঠাণ্ডা লাগিয়া শচীনবাবু অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। জ্বর সামান্য, কিন্তু ভয়ানক মাথার যন্ত্রণা। দালানে শুইয়া ছিলেন। খোকা তাহার সাধ্যমত পরিচর্য্যা করিতেছিল।

সেদিন টিনের ঘরের ক্রেতা মিস্ত্রি ও লোকজন লইয়া চালের টিন খুলিতে আরম্ভ করিল। টিনের উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দ হইতেছে অত্যন্ত তীব্র। প্রতিটি আঘাতের শব্দে মনে হইতেছে যেন তাঁহার মাথায় হাতুড়ি পিটিতেছে। আওয়াজ অসহ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কিছু নাই।

শচীনবাবু চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলেন। এক একখানা টিন খুলিয়া পড়িতেছে, বেড়া অপসারিত হইতেছে

মনে পড়িল, তিনি নিজে মিস্ত্রির সঙ্গে থাকিয়া থাকিয়া এইগুলি করিয়াছিলেন, কত শ্রমে কত যত্নে কত আশা-উদ্দীপনা লইয়া। তাঁহার মায়ের ও মীরার সযত্ন পরিমার্জ্জনে ঘরদোর যেন পবিত্র হইয়া উঠিত। দীর্ঘকালের স্মৃতিবিজড়িত পিতামহী-জননী-গৃহিণীর কল্যাণকরস্পর্শপূত সেই বাস্তুভিটা শূন্য হইতে চলিয়াছে।

শচীনবাবুর বুকের মাঝে হাহাকার করিয়া উঠিল। কোথায় স্বর্গতা মাতা, কোথায় মীরা? তাঁহাদের অন্তরও কি আজ এমনি হাহাকার করিতেছে?

টিনের উপর অবিরত হাতুড়ির আওয়াজ যেন সরাসরি একেবারে

মাথার ভিতরে গিয়া ঢুকিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বার বার চোখ ভরিয়া জল আসিতেছে।

শচীনবাবু ব্যাকুল ভাবে কহিলেন, খোকা, ওদের একবার ডাক্, উঃ! আর ত পারি না।

খোকা ডাকিয়া আনিল। ক্রেতা নিজেই আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল।

শচীনবাবু ব্যগ্রভাবে কহিলেন, বড় মাথা ধরেছে, হাতুড়ির শব্দ সহ্য হচ্ছে না, আর একদিন না হয় ভাঙতে—

—এতগুলি লোক এনেছি।

—আমি দু'চার দিনের মধ্যেই চলে যাব, তার পরেই না হয় ঘরখানা নিয়ে যেতে—

—এতগুলি লোকের মজুরী থামোকা দিতে হচ্ছে। তাতে ঘর কিনে আমার লোকসান হয়েছে—

শচীনবাবু কহিলেন, লোকসান হয়েছে?

—হ্যাঁ, সবাই বলছে, আর দু-চার মাস পরে এরকম ঘর এমনিই পাওয়া যাবে। আর তা যদি নাও হয় তা হলে বিশ-পঞ্চাশ টাকায় তো নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে!

শচীনবাবু হতাশভাবে পুনরায় শুইয়া পড়িলেন। লোকটি সান্ত্বনা দিবার স্বরে কহিল, এই ত হয়ে গেছে, একটু কষ্ট করে থাকুন—

শচীনবাবু শুইয়াই রহিলেন। ঘরের টিনগুলির সঙ্গে সঙ্গে বুকের পাঁজরগুলিও যেন খুলিয়া পড়িতেছে। নিদারুণ বেদনায় উৎসারিত অশ্রু গোপন করিতে তিনি বিছানায় মুখ গুঁজিয়া মৃতের মত পড়িয়া রহিলেন।

*

সুস্থ হইয়া শচীনবাবু দেরী করিলেন না। একটা শুভদিন দেখিয়া নৌকা ঠিক করিয়া ফেলিলেন।

খালের ঘাটে নৌকায় প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র বোঝাই হইল। শচীনবাবু পুরাতন মণ্ডপে শেষ প্রণাম করিয়া খোকাকে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। প্রতিবেশী স্ত্রী-পুরুষ সকলে সমবেত হইলেন বিদায় দিতে।

তারিণী খুড়ো কহিলেন, আমাদের ফেলে রেখে ত চললে বাবা! কপালে কি আছে জানি না। যদি সময় হয় মাঝে মাঝে না হয় এমনিই বেড়াতে এস।

শচীনবাবু ফিরিয়া চাহিলেন, পিছনে দেখা যায় তাঁহাদের ভিটার উপর ন্যাড়া খুঁটিগুলি দাঁড়াইয়া আছে। পূর্ব্বপুরুষের অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া তাহারা যেন সূর্য্যকিরণে চক্ চক্ করিতেছে। এই গৃহ—ইহারই আকর্ষণে কত শত ক্রোশ অতিক্রম করিয়া প্রবাসী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে।

খোকা প্রশ্ন করিল, আমরা আর বাড়ী আসব না বাবা!

শচীনবাবুর বুকের মাঝে রুদ্ধ ক্রন্দন গুমরিয়া মরিতেছিল। তিনি কহিলেন, না বাবা, এই শেষ—

কথাটির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, মাঝি নৌকা ছাড়ো।

তাঁহার অন্তর আর্ত্তনাদ করিতেছে। ফিরিয়া দেখেন শূন্য ভিটায় সেই একক খুঁটিগুলি সহস্র স্মৃতির পতাকা উড্ডীন করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘাটের পার্শ্বে অপস্রিয়মান জনতার পাছে অশ্রুচোখে দাঁড়াইয়া আছে কিরণের মা—তাহার মায়ের সমবয়সী নমশূদ্র বিধবা।

*

শচীনবাবু পঞ্জিকা দেখিয়া শুভদিনেই রওনা হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু দিনটা সত্যই শুভ কিনা তাহা বলা কঠিন।

কলিকাতার উপকণ্ঠে তাঁহার এক আত্মীয় চাকুরী করিতেন, তিনি প্রথমে তাঁহারই আশ্রয়ে আসিয়া উঠিলেন। তিনি জানিতেন বেশী দিন এ

আশ্রয়ে থাকা চলিবে না। স্থান নাই, রেশনের মাপাজোখা চাল, এখানে দুই-চার দিনের বেশী থাকা সঙ্গত নয়। তিনি একটা বাসা খুঁজিতে লাগিলেন। যা জোটে তিনি ও খোকা উভয়ে মিলিয়া রাঁধিয়া খাইবেন, মাষ্টারী টিউশনি করিয়া শ'খানেক টাকা রোজগার করিতে পারিলে, ধীরে ধীরে একটু জায়গা কিনিয়া খোকার মাথা গুঁজিবার একটু ঠাঁই করিয়া দেওয়াও হয়ত অসম্ভব হইবে না। তাহা হইলেই তাঁহার ছুটি।

বাসা খুঁজিতে লাগিলেন, কিন্তু বাসা কোথায়? লাখো লাখো লোক আসিয়া গ্যারেজ, গোয়াল, ভাঙা-বাড়ী সবই উচ্চহারে ভাড়া করিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও তিল ধারণের স্থান নাই। বাসাটা আত্মীয়বাড়ীর নিকটে হইলেই ভাল হয়। তিনি এখানে ওখানে গেলে খোকার বাড়ীতে থাকিতে অসুবিধা হইবে না এবং তাঁহারা তাহাকে একটু দেখাশুনাও করিতে পারিবেন। বহু চেষ্টায় নিকটেই একটি বাড়ীর সন্ধান পাওয়া গেল। ভাঙা বড় বাড়ী, একপাশ ধ্বসিয়া গিয়াছে, সেখানে অশ্বত্থ গাছ জন্মিয়াছে, কিন্তু অন্যপার্শ্বের দুইটি ঘর ভাল আছে, একটিতে রান্নাবান্না চলে ও অন্যটিতে থাকা যায়। এই বাড়ী ভাড়া হইতে পারে তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারে নাই। আত্মীয়টিকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীওয়ালার সহিত শচীনবাবু দেখা করিলেন। তাঁহারা কলিকাতাবাসী, পূজায় বাড়ীতে আসেন, ধূমধাম সহকারে পূজা করিয়া চলিয়া যান। দানধর্ম্ম যথেষ্ট। শুনিয়া শচীনবাবু আশান্বিত হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় মালিকের বাড়ী বিরাট। সামনেই কল, তাহার পাশে গ্যারেজ—তিনখানি মোটর। কর্ত্তা বাড়ীতেই ছিলেন, শচীনবাবুর আত্মীয় পাঁচুবাবুকে তিনি চিনিতেন। বলিলেন, এস হে পাঁচু, কলকাতা এসেছ কেন? বাজার করতে।

প্রাথমিক আলাপ-পরিচয়ের পরে পাঁচুবাবু প্রস্তাব করিলেন, এই

ভদ্রলোক বাস্তুত্যাগ করে আসতে বাধ্য হয়েছেন, আপনাদের পুরনো ভাঙা বাড়ীতে এঁকে যদি আশ্রয় দেন।

—নিশ্চয়ই। ওদের সাহায্য করাই উচিত, কেন করব না? জায়গা জমি বাসা ত দিতেই হবে!

—উনি দরিদ্র শিক্ষক ছিলেন, বর্ত্তমানে বেকার, আপনারা বড়লোক, ভাড়া আর কি নেবেন?

মালিক হাসিয়া সিগারেটের ছাই ঝাড়িয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, সেটা ঠিকই বলেছ পাঁচু, দেওয়াই উচিত, কিন্তু একটা নিয়মিত ভাড়া না দিলে ওঁরও দাবি থাকে না, আর ধর আমারও মতিভ্রম হয়ে কোন দিন বলতে পারি উঠুন মশায়। কিন্তু ভাড়া দিলে আজকাল আইনে আর ওঠাবার উপায় নেই। একটু থামিয়া তিনি পুনরায় হাসিয়া বলিলেন, বুঝেছ, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে কাজ করতে হয়। আমি একাই ত মালিক নয় সরিক আছে।

শচীনবাবু কথাটার সত্যতা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বলিলেন, তা হলে ভাড়াটা

—হ্যাঁ, কিন্তু সেটা আমি ত বলতে পারি না। দশ জনের অংশ আছে। আমি যদি কম ভাড়া বলে ফেলি ভায়ারা বলবেন, বাড়ী ভাড়া দেওয়াটা আমাদের ব্যবসা, বাড়ীগুলো ধর্ম্মশালা নয়। তাই বলি পাঁচু, আমি ওখানকার সরকার কেষ্টকে বলে দেব তার সঙ্গে ঠিক করে নিও। সে উচিত ব্যবস্থা করে দেবে, আমারও দোষ রইল না, তোমাদেরও কাজ হাসিল।

তাঁহারা বিদায় লইলেন। শচীনবাবু ভদ্রলোকের কথায় সহানুভূতির সুর লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইলেন।

দুই-চার দিন পরে সরকার কেষ্ট জানাইল, হুকুম আসিয়াছে, ভাড়া মাসিক ২৫৲ টাকা।

পাঁচুবাবু চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন, বল কি? ছ'মাস আগে এর ভাড়া আট আনাও হ'ত না, ২৫৲ টাকা চাইছে।

—আমার হাত ত নয়, বাবু বলেছেন। তিনি বললেন, যে রকম রিফুজি আসছে তাতে তিরিশ টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া হবে। আর বলতে কি সকালেই এক ভদ্রলোক ২০৲ টাকা বলে গেছে।

শচীনবাবু চিন্তা করিলেন। পাঁচুবাবু বলিলেন, মানুষ বিপদে পড়লে কি এমনি করে তাকে শোষণ করা ভাল, না এটা ধর্ম্ম?

কেষ্ট হাসিয়া বলিল, বাবু বলেন, মানুষ বিপদে না পড়লে টাকা দেয় না।

শচীনবাবু অনেক চিন্তা করিলেন, কুটুম্বের গলগ্রহ হইয়া থাকা যায় না। যাহা হউক, দুই-চার মাস থাকিয়া কোথাও চাকুরী পাইলে সেখানেই চলিয়া যাইবেন, কয়েক মাস না হয় ভাড়া দিলেনই। শচীনবাবু পাঁচুবাবুকে তাঁহার মত জানাইলেন, পাঁচুবাবুকে তাঁহার মত জানাইলে, পাঁচুবাবুও একটু হৃষ্টভাবে বলিলেন, যা বলছেন, অবস্থা যা হয়েছে শেষে ঐ বাড়ীই হয়ত চল্লিশ টাকা ভাড়া হবে।

অতএব শচীনবাবু খোকাকে লইয়া ভাড়াবাড়ীতে আসিয়া উঠিলেন।

*

প্রথম দিন নূতন বাসায় যাইয়া খোকা মহা পুলকিত হইল। সে পরম উৎসাহে ভাঙ্গা হাতে জল আনিল, চাল ধুইল, শচীনবাবু কোন মতে খিঁচুড়ি রাঁধিয়া নামাইলেন। খোকা খাইতে খাইতে পরম উৎসাহে বলিল, বেশ হয়েছে, বাবা, আমিও ত রাঁধতে পারি।

আহারান্তে প্রথম কাজ রেশনকার্ড করিতে রেশন আপিসে যাওয়া। খোকাকে বাসায় থাকিতে বলিয়া শচীনবাবু রওনা হইলেন। রেশন আপিসে দরখাস্ত দিয়া জানিতে পারিলেন, পনের দিন বাদে কার্ড পাওয়া যাইবে।

তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, কিন্তু এই দু হপ্তা কি খাব ?

কর্ম্মচারীটি জবাব দিলেন,—এতদিন যা খেয়েছেন তাই খাবেন।

—তা হলে প্রকারান্তরে আপনারা কালোবাজারে কিনতে বলছেন।

—আমরা বলি না, তবে মানুষ প্রয়োজনে করে ··আমরা ইনস্পেক্টর পাঠাব, তাঁরা রিপোর্ট দেবেন, তার পর কার্ড লেখা হবে, ইত্যাদি—তাতে পনের দিন কি বেশী সময় ?

—কিন্তু আপাততঃ পনের দিনের খাবার দিতে পারেন না ? আর একটু কেরোসিন—

—সে অনেক দেরি, কার্ড পাকা হবে তারপর।

—ততদিন।

—বাতি জ্বালাবেন, দেশী বাতি, দেশী শিল্পের উন্নতি হউক। তিনি চলিয়া গেলেন। শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। লোকটি যাহা বলিয়াছে তাহার সবই সত্য।

শচীনবাবু ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, খোকা সারা দ্বিপ্রহর অশেষ শ্রমে ঘর সাজাইয়াছে, তাহার ফলে সব তচনচ হইয়া গিয়াছে। জল আনিতে ঘর ভিজিয়াছে, বাসন গোছাইতে কাপ ভাঙ্গিয়াছে, বিছানা করিতে বালিশ ছিঁড়িয়াছে, ইত্যাদি। তিনি পুনরায় সমস্ত গুছাইয়া বাহিরের বারান্দায় বসিলেন। এক ভদ্রলোক অদূরে গামছা পরিয়া হুঁকা টানিতেছিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনি বুঝি ভাড়া নিয়েছেন ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

উভয়ের পরিচয় হইল। শচীনবাবু জানিতে পারিলেন, ভদ্রলোক বাড়ীতেই থাকেন, কিছু ভূসম্পত্তি আছে, তাহাতে কোনমতে চলিত, বর্ত্তমানে দুইখানা বাড়ী ভাড়া দিয়া ভাল ভাবেই চলিতেছে। শেষে বলিলেন,

তবে আমি ত বড়লোক নয় তাই বুঝি আপনাদের দুঃখ, আগে ত এখানকার বাড়ী ভাড়াই হ'ত না, অধিকন্তু লোক রাখতে হ'ত দেখাশোনার জন্যে। এখন সেখানে ভাড়া পাচ্ছি…পাঁচখানা ঘর পঁচিশ টাকা ভাড়া। মন্দ কি? বেশ চলে যাচ্ছে, জিনিষপত্রের দাম যদি বাড়ে বলব তাদের আরও কিছু দিতে। অধর্ম্ম করব না—তবে ওঁরা বড়লোক, ওঁরা ত আপনার কাছে পঁচিশ টাকা নেবেনই, আগে জানলে আমি একখানা ঘর আপনাকে দিতাম কিন্তু এখন—

শচীনবাবু সমবেদনায় একটু বিচলিত হইয়া বলিলেন, সকলেই ত ধর্ম্মভীরু হয় না। তবে আপনি ভাববেন না, চাকুরির চেষ্টা করছি, পেলেই চলে যাব। আপাততঃ আশ্রয়টুকু চাই।

সকাল বিকাল সেই ভদ্রলোক হুঁকা হাতে করিয়া প্রায়ই আসিতেন। তাঁহার নাম মহেশ ভট্টাচার্য্য। ধীরে ধীরে শচীনবাবুর সঙ্গে তাঁহার বেশ অন্তরঙ্গতা হইল। লোকটি সহানুভূতিশীল, গাছের দুটি ফল, কখনও একটু রাঁধা তরকারি হাতে করিয়া আসিয়া গল্প করিতে বসিতেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, কেন অন্যত্র যাবেন, এখানেই থাকুন। আপনার সঙ্গে কথা বলে যেন বেশ আনন্দ পাই।

শচীনবাবু বলেন, কিন্তু সে ভগবানের হাত, যেখানে চাকরি পাব সেইখানেই মাথা গুঁজবার একটুখানি ঠাঁই করে নিতে হবে। ঠিক বাড়ী বলতে যা বুঝায় তা এ জীবনে হবে না।

মহেশবাবু বলেন, কেন?

শচীনবাবু হাসিয়া বলেন, বাড়ী মানে ত কেবল কয়খানি ঘর নয়। বাড়ীর সঙ্গে থাকে নাড়ীর যোগ—পূর্ব্বপুরুষের আর নিজের শৈশবের শত স্মৃতি বিজড়িত হলে তবেই বাড়ী হয়।

শচীনবাবু ভাবেন নিজের বাড়ীর কথা,—পিতামাতা আত্মীয় পরিজন বাড়ীতে যাঁহারা থাকিতেন তাঁহাদের কথা। তাঁহার মাতা অপত্যস্নেহে

একটি নারিকেলগাছ প্রতিপালন করিয়াছিলেন, কিন্তু আজ তাহার অস্তিত্ব নাই। শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন···

'কিছু না, কিছু না—মন থেকে সব ঝেড়ে ফেলে আবার নূতন করে আরম্ভ করুন'—বলিয়া মহেশবাবু সন্ধ্যার অন্ধকারে বিদায় গ্রহণ করেন। শচীনবাবু একলা বসিয়া থাকেন পুঞ্জীভূত বেদনার বোঝা বুকে লইয়া। অতীতের কত স্মৃতি, দুঃখ আনন্দের কত কথা মনের মাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়। বার বার মনে হয়, ফিরিয়া যান সেই চিরপরিচিত উদার মাঠের পথে আম্রকানন ঘেরা আপনার গৃহে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হয়, সে গৃহ আর গৃহ নাই, তা লাঞ্ছনার কণ্টকশয্যা। দুঃখ হয়—যে দেশের জন্য যাঁরা জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে সে দেশে তিনি অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত, অনুগ্রহপ্রার্থী মাত্র। মহেশবাবুর সান্ত্বনাকে ছাপাইয়া কত লাঞ্ছনা আসে নিত্য জীবনের মাঝে। তবুও মন্দের ভাল যে, ঐ লোকটি সহৃদয় প্রতিবেশী। ইঁহার সান্নিধ্য হৃদয়ের ক্ষতস্থানে একটুখানি শান্তির প্রলেপ বুলাইয়া দেয়।

*

শচীনবাবু কলিকাতা যাইবার জন্য একটা রেলের মাসিক টিকিট করিয়াছেন।

প্রত্যহ সকালে রাঁধিয়া খাইয়া তিনি কলিকাতা রওনা হন। সেখানে পৌছিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্যার্থ যে সকল আপিস খোলা হইয়াছে সেগুলিতে ঘোরাফেরা করেন, চাকরির জন্য দরখাস্ত পেশ করেন এবং সন্ধ্যায় ক্লান্ত দেহে বড়বাজার হইতে বাজার করিয়া ফিরিয়া আসেন। রোজই আশা লইয়া যান, হয় ত একটা চাকরির সংবাদ পাইবেন, কিন্তু অত্যন্ত নিরাশায় দুঃখিত অন্তরে ফিরিয়া আসেন।

এমনই করিয়া তিনটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। হাতে টাকা যা ছিল ধীরে ধীরে তাহা ফুরাইয়া আসিতেছে—শীঘ্রই হাত একেবারে খালি

হইয়া যাইবে, ইহার পূর্ব্বে যদি একটু জমি সংগ্রহ না করা যায় তবে মাষ্টারী করিয়া আর তাহা হইবে না। তিনি জমি কিনিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

পাচুবাবু সংবাদ লইয়া আসিলেন। বাবুরা দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাদের কয়েক বিঘা জমি বিলি বন্দোবস্ত করিবেন। শচীনবাবু ভাবিয়া দেখিলেন এখানে তবুও এক ঘর আত্মীয় আছে, এখানে জায়গা কিনিলে শচীনবাবুর অবর্ত্তমানেও খোকা একজন আত্মীয় পাইবে, কিন্তু অন্যত্র খোকা একেবারেই অসহায়। যেরূপ আশ্রয়প্রার্থী আসিতেছে তাহাতে অচিরেই জমির মূল্য আগুন হইয়া উঠিবে, অতএব হাতে টাকা থাকিতে কিছু জায়গা কিনিয়া রাখা প্রয়োজন। দুই মাসে না হোক ছয় মাসে একটা চাকরি হইবেই। শচীনবাবু অনেক চিন্তা করিয়া মন স্থির করিলেন—সেলামী বিঘাপ্রতি আট শত টাকা। খাজনা বার্ষিক পঞ্চাশ টাকা। আশেপাশে জমি এই দরেই বিলি হইয়াছে—বিলম্ব করা হয়ত সমীচীন হইবে না। শচীনবাবু সেদিন সারাদিন ঘুরিয়া চার শত টাকা সেলামী ও পঁচিশ টাকা বার্ষিক খাজনায় দশ কাঠা জমি বন্দোবস্ত করিয়া ক্লান্ত দেহে ফিরিয়া আসিলেন।

বড় তৃষ্ণা পাইয়াছিল তাই হাত-পা ধুইয়া একটু গুড় ও জল খাইয়া ডাকিলেন, খোকা!

খোকা কহিল, কি বাবা?

—ওই যে বড় তেঁতুলগাছ ওর পাশে বাঁশঝাড়ের পরে যে জায়গাটুকু ওখানে তোর বাড়ী হবে।

খোকা উজ্জ্বল চোখ দুইটি মেলিয়া কহিল, আমার বাড়ী!

—হ্যাঁ, দুখানি পাকা ঘর, সামনে ফুলের বাগান, আর পিছনে—

—জামরুল গাছ বাবা। আর পেয়ারা গাছ—

—হ্যাঁ।

—কবে হবে বাবা ?

—এই ত চাকরি হলেই আরম্ভ করব ।

—মা আসবে ত ?

শচীনবাবু হঠাৎ থামিয়া গেলেন। তাহার পর কহিলেন, হ্যাঁ—আসবে বৈ কি !

বাহিরে কে যেন ডাকিল—'শচীনবাবু' 'শচীনবাবু'। হুঁকার শব্দ ও কণ্ঠস্বরে বুঝা গেল মহেশবাবু। শচীনবাবু কহিলেন, বসুন, যাচ্ছি।

মহেশবাবুর ধূমপানের রকম দেখিয়াই শচীনবাবু অনুমান করিলেন তিনি উত্তেজিত। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমাগত হুঁকা টানিতেছেন। শচীনবাবু সহাস্যে কহিলেন, বসুন মহেশবাবু।

মহেশবাবু ধুপ করিয়া বারান্দায় বসিয়া বলিলেন, মশায়, আপনার বাড়ী কোন্ জেলায়।

—যশোর।

মহেশবাবু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন, আচ্ছা, আপনারা সব মরতে এখানে এসেছেন কেন বলুন দেখি। আপনাদের সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলে মনের দুঃখ যায়।

—কি হ'ল ?

—'আবার কি হবে ?' মহেশবাবু অত্যন্ত উত্তেজনার সঙ্গে ধূম উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, 'আপনারা বড় সহজ পাত্র নন মশাই। কয়জন আশ্রয়প্রার্থী আমাকে এসে ধরলে যে এখানে বাড়ী করবে, সব শিক্ষিত ভদ্রলোক, কিছু জায়গা দিতে হবে। আমিও ভাবলুম সত্যিই তারা বিপাকে পড়েছে, তাই এক ভদ্রলোককে পাঁচ বিঘা জমি দিলাম। সে নাকি তার আত্মীয়স্বজনকে বণ্টন করবে, ভাল। লাভ-লোকসান ভাবি নি, দয়া হ'ল দিলাম নইলে জমি দেওয়ার দায় কি। একশ টাকা বিঘে, আড়াই টাকা খাজনা প্রতি বিঘায়—

—তারপর—

—সেই নচ্ছার পাজি কি করেছে শুনবেন, কাঠা পঞ্চাশ টাকা আব খাজনা কাঠাপ্রতি আড়াই টাকায় তার দেশভায়েদের বিলি করেছে, প্রচুর মুনাফা নিযে বাড়ী আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমি দেখে নেব, কালই উকিলের কাছে যাচ্ছি, দেখি বেটার কত টাকা আছে।

—তাতে কি হবে—জায়গাটা কোথায় ?

—ঐ ত তেঁতুলতলার পরের বাঁ হাতি জমিটা। একটা জঙ্গুলে জায়গা। বিজয়নগর কালোনি হচ্ছে। ধুত্তোর নিকুচি করেছে।

শচীনবাবু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, আমিও ত ওরই পাশে জমি কিনেছি দশ কাঠা—চার শ টাকা সেলামী, ২৫৲ টাকা খাজনা—

—ঠিক হয়েছে, কেন নেবে না। আপনাদের টাকা চুষে নেবে, দোষ কি ? বাড়ীভাড়া পঞ্চাশ টাকা নেবে। এই বাজারে আমিই ভালমানুষি করে ঠকলাম।

শচীনবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন, আপনার কথায় একটা জিনিষ পরিষ্কার হ'ল !

—কি ? কি হ'ল ?

—এক দল লোক জগতে এমনি লাভ করে; করবার বুদ্ধি আছে বলে ; আর এক দল লোক আছে যারা আপনার মত ঠকে। ভালমানুষি করে এরা নিজের সর্ব্বস্ব খোয়ায, আর তাদের ভালমানুষির সুযোগ নিযে অন্যেরা বড়লোক হয়।

মহেশবাবু ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিলেন, ঠিক, ঠিক বলেছেন শচীনবাবু। নইলে বাড়ী একজনে পঞ্চাশ টাকা বলে গেল, তাকে ভাড়া দিলুম না কেন জানেন ? কারণ আর একজনকে কথা দিয়েছি ত্রিশ টাকা ভাড়ায় থাকতে দেব বলে।

—ঠিক তাই। আমিও আপনারই মত, একশ টাকায় জমি কিনে

হাজার টাকায় বিক্রি করিনি বলে পঞ্চাশ টাকার জমি পাঁচ শ টাকায় কিনলাম—আমাদের মত বোকা যারা, তাদের পক্ষে ঠকাটাই স্বাভাবিক।

মহেশবাবু আরও কিছুক্ষণ নির্ব্বাপিত হুঁকা টানিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, কিন্তু যাই বলুন আমি উকিলের পরামর্শ নিয়ে দেখব, তু-চার নম্বর দেওয়ানী করে দেখবই।

—অন্যায়ের প্রতিকার কোনকালে হয় নি, হবেও না! ওর জন্যে বৃথা টাকা খরচ করে কি হবে!

—না হোক—দেখবই কি হয়।

মহেশবাবু উত্তেজিত ভাবেই চলিয়া গেলেন।

*

আরও তুই-এক মাস চলিয়া গেল।

শচীনবাবু কলিকাতায় চাকুরির সন্ধানে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে প্রায় নিঃসম্বল হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু কোন সুবিধা এখনও হয় নাই। একজন হোমরা-চোমরা সেদিন একটা মাষ্টারীর জন্য তাঁহার একখানা দরখাস্ত বিশেষভাবে অনুমোদন করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। সেই চাকুরী অবশ্যই হইবে এইরূপ ধারণা তাঁহার জন্মিয়াছিল, তাই অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া সোৎসাহেই তিনি আজ কলিকাতা রওনা হইলেন।

আশ্রয়প্রার্থীদিগের সাহায্যার্থ প্রতিষ্ঠিত সরকারী আপিসে ভিড় ক্রমশঃ বাড়িতেছে। শচীনবাবু উক্ত অফিসারের সহিত দেখা করিবার জন্য বসিয়াছিলেন। বেয়ারা জানাইল, তিনি লঞ্চ খাইতে গিয়াছেন তুইটার পরে সাক্ষাৎ হইবে—

অপেক্ষা করিতেই হইবে, তাই একটা বেঞ্চিতে বসিয়া ছিলেন। হঠাৎ একজন খদ্দরমণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, শচীনবাবু নমস্কার!

শচীনবাবু চাহিয়া দেখেন, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচিত মণিবাবু। তিনি নমস্কার করিতে ভুলিয়া গেলেন।

—কি চিনতে পারছেন না ?

—চিনতে পেরেছি, কিন্তু—

—অবাক হয়ে যাচ্ছেন এই ত, তা হোন্, ক্ষতি নেই। কিন্তু এখানে কেন ? আসুন আমার ঘরে। কার সঙ্গে দেখা করবেন ?

—কমিশনার সাহেব না কে, এই ঘরে বসেন।

—অনেক দেরি আছে তাঁর আপিসে আসবার। এখনও আসেন নি।

—তিনি লাঞ্চ খেতে গেছেন—

—ওটা আমরা বলে থাকি, কিন্তু আপিসেই আসি দুটোয়। যাক্ আসুন।

শচীনবাবু মণিবাবুর পিছন পিছন চলিলেন। মণিবাবু একজন বিশিষ্ট অফিসার, ঘর আলাদা। তিনি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন, বসুন শচীনবাবু —বোধ হয় চাকরির জন্য, না ?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু লাখো লাখো লোকের চাকরির ব্যবস্থা কোন সরকারই করতে পারে না। আর আমরা আপনাদের দরখাস্ত পাঠালে তাতে কাজ হবে এমন কোন ভরসা তো দিতে পারছি না—কাজেই

—হ্যাঁ, এত দরখাস্ত দিলুম, একটা চাক্‌রি পঞ্চাশ ষাট্ টাকার জুটল না !

—কি করে জুটবে ! কোন সাহায্য পেয়েছেন সরকার থেকে।

—না, শুন্‌ছি, স্কিম হচ্ছে।

—হ্যাঁ, স্কিম হচ্ছে বৈকি ? স্কিম হতেই ধরুন সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ হ'ল। সোজা কথা ত নয় ! তবে যারা কংগ্রেসের কাজ

করেছে, ধরুন আমাদের মত যারা, তারা কিছু সুযোগ সুবিধা অবশ্য পেয়েছে।

শচীনবাবুর চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিতেছিল। লোকটা সজ্ঞানে কথা বলিতেছে ত ?

মণিবাবু হাসিয়া বলিলেন, কি বল হে বটু—

বটু পাশের টেবিল হইতে মাথা তুলিয়া বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

মণিবাবু একটু থামিয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন, আমরা আপনাদের রিলিফের ব্যবস্থা করতে পারি আর নাই পারি অন্ততঃ এই সব ছোটখাটো চাকরি পেয়ে নিজেরা যথেষ্ট রিলিফ বোধ করছি।

শচীনবাবুর মনটা এমন বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল যে মণিবাবুর সহিত তাঁহার আর বাদ-প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি সংক্ষেপে কহিলেন, আমি উঠি, কাজ আছে।

—বসুন, আমি নিয়ে যাবো আপনাকে তাঁর কাছে।

—থাক্, আজ আর দেখা করব না—

শচীনবাবু উঠিয়া আসিলেন। সাহায্যের কোন আশা নাই বুঝিলেও একবার শেষ চেষ্টা করিয়া যাইবেন মনে করিয়া তাঁহার মুরুব্বী অফিসারের ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইলেন। একটু পরেই একটি যুবক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল—সত্য।

—সত্য !

—হ্যাঁ—স্যার, আপনি এখানে !

—হ্যাঁ, চাকরীর চেষ্টায়।

—থাক্, আপনি আর এখানে আসবেন না। চলুন—আমার সঙ্গে।

—কোথায় ?

—চলুন না, অনেক কথা আছে। অনেক সংবাদ আছে। এখানে ঘুরে কিছু হবে না—চলুন।

—চল।

*

ডালহৌসী স্কোয়ারের একটা নিরালা জায়গায় বসিয়া সত্য কহিল, বসুন স্যার। ভাল আছেন্? খোকা?

শচীনবাবু বসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, ভালই।

—কোথায় আছেন?

—এই মাইল পনের দূরে। একটা ভাঙ্গা বাড়ী ভাড়া করে আছি। যা এনেছিলাম সব গেছে।

সত্য প্রশ্ন করিল,—চাকুরীর চেষ্টায় বা সাহায্যের আশায় এখানে আসেন ত?

—হ্যাঁ।

—আর আস্বেন না।

—কেন?

—মণিবাবুকে দেখেও কি বুঝতে পারেন নি? সাহায্য করার উদ্দেশ্য ওঁদের নেই। আপনি এটুকু বুঝবেন আশা করেছিলাম।

—তা ত বুঝি নি।

—হ্যাঁ, চাকরিও এরা দিতে পারে না। চাকরির সন্ধানে বৃথা ঘোরাঘুরি করে নিঃসম্বল হয়ে কি লাভ? চাকুরী দেওয়া বা সাহায্য করা এদের উদ্দেশ্য নয়। এরা চায় বাস্তহারাগণ যাতে সংঘবদ্ধ না হ'তে পারে তাই বৃথা আশায় ঘুরিয়ে আপনাদের অর্থহীন পঙ্গু করতে চাইছে। যাক্ সেকথা, আমাদের ওখানে চলুন আজ।

—আমাদের মানে, তোমরা কে কে এখানে আছ এখন?

সত্য একটু লজ্জিত ভাবে বলিল, আপনি জানেন না, অঞ্জলিকে আমি বিয়ে করেছি। সে মাষ্টারী করছে। বাসা হাওড়ায়, আমি আপাততঃ কিছু করি না। যাবেন আজ? আমরা সত্যিই খুশী হব।

—আজ ত হয় না সত্য! বাসায় খোকা একা, সন্ধ্যায় পৌছুতেই হবে আমাকে।

—তবে থাক্, এক দিন সকাল সকাল যাবেন। সত্য আগ্রহ সহকারে ঠিকানা ও যাইবার রাস্তা বলিয়া দিল।

শচীনবাবু বলিলেন, কিন্তু বড়ই বিপন্ন বোধ করছি আজ। আর এক মাসের মাঝে চাকরি না পেলে খোকাকে আর আমাকে অনাহারে মরতে হবে।

সত্য হাসিয়া বলিল, আপনার মত সরল যাঁরা, তাদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি অনাহারে মৃত্যু।

—কেন?

—সরকারের উপর আপনার আস্থা আছে বলেই একথা বলতে হ'ল। এঁদের কাছে বেশী আর কি আশা করতে পারেন। অথচ এঁদেরই কথায় আমরা জেলে গিয়েছিলাম—আপনি গৃহহীন। কিন্তু আমরা আজ সব দিক দিয়ে বঞ্চিত। জমির দাম দশগুণ, ঘরের ভাড়া বিশগুণ, ধনিকরা বেশ দু'পয়সা করে নিয়েছে আমাদের সর্ব্বস্বান্ত করে, তারা ফেঁপে উঠছে আমাদের শোষণ করে। নেতারা দেশসেবার মূলধনকে গুড় চিনি কাপড়ের ব্যাপারে লাগিয়ে সুদশুদ্ধ আদায় করে ঘরে তুলছেন, কিন্তু আজ আমরা আশ্রয়প্রার্থী মাত্র, এ ছাড়া আমাদের অন্য পরিচয় নেই, আমরা অত্যন্ত করুণার পাত্র, ভিখারী।

বলিতে বলিতে সত্য উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল। শচীনবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, কিন্তু কয়েকজনের অনাচারের জন্য এতবড় একটা মহৎ প্রতিষ্ঠানের প্রতি এমনি দোষারোপ করতে পার না তুমি। এ তোমার অভিমান!

—অভিমান নয় স্যার। আমি সাহায্য পাই নি, চাকরি পাই নি, টাকা পাই নি বলে আমার অভিমান নয়। যেদিন আপনার পদধূলি নিয়ে পুলিসের লাঠির সামনে মাথা পেতে দিয়েছিলাম সেদিন চেয়েছিলাম দেশের মুক্তি, তার বিনিময়ে যশ খ্যাতি অর্থ কিছুই আমার কাম্য ছিল না। আজও নিজের জন্যে কিছু চাই না, কিন্তু দুর্ব্বলের শোষণদ্বারা কাউকে আত্মপ্রতিষ্ঠা করতে দেওয়া কাপুরুষতা। যারা দেশের মুক্তি এনেছে তারা দারিদ্র্যের হাতে থেকে মুক্তি পেতে পারে না? গৃহহারাকে গৃহ দিতে পারে না? সাম্রাজ্যবাদীর উচ্ছেদ করে তারা পরাজিত হ'ল কালোবাজার আর ধনিকের অন্যায়ের শোষণের কাছে? সত্য স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া দৃঢ় কণ্ঠে পুনরায় কহিল, আমরা জীবনপথে তার প্রতিরোধ করব। পুঁজিবাদীর স্পর্দ্ধা স্বীকার করব না, তার অহমিকাকে ধূলিসাৎ করব। যেমন করে একদিন বলেছিলাম ভারতকে স্বাধীন করব

—তোমার কথা শুনে আজ সন্দেহ হয় যে···। তাঁহার মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া সত্য বলিল, আমি সাম্যবাদী! যে নামই আমাকে দিন, কিন্তু আমি জানি আমরা এসেছি মরতে। তবে আপনি মরবেন অনাহারে, আমরা মরব গুলির আঘাতে, এই তফাৎ!

—তার মানে?

—এই পৃথিবীতে একদল লোক জন্মায় আমাদের মত যারা নিঃশেষে নিজেদের জীবন আহুতি দিয়ে যায়। তাদের রক্তের উপরে গড়ে ওঠে নূতন সম্পদ, নূতন সমাজ, নূতন রাষ্ট্র—তারা তার ফলভোগ করে না। তারা আত্মবলি দিতেই জন্মায়, কিন্তু তাদেরই শোণিতে পৃথিবীর গ্লানি দূর হয়, আর যারা সুবিধাবাদী তারা সেই সুযোগে নিজেদের আখের গুছিয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করে। জগতের এই নিয়ম।

—জগতের এই নিয়ম?

—হ্যাঁ, যে সমস্ত সৈনিকের রক্তপাতের ফলে নেপোলিয়নের বিজয়স্তম্ভ

গড়ে উঠেছিল তারা কি পেয়েছে জগতে? যিশুর মানবপ্রেমের পুরস্কার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু। এমনি আরো কত দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। তাই বলছি ক্ষমতার মোহে যারা আজ মত্তপ্রায় তাদের কাছে আপনি কি আশা করেন?

শচীনবাবু চিন্তান্বিতভাবে বলিলেন, কিন্তু এত লোককে সরকার কি করে সাহায্য করতে পারেন?

—কেন? যুদ্ধ হলে লক্ষ লক্ষ লোককে সৈন্যবাহিনীতে ভর্ত্তি করা হয় না? সে যাক্, যারা আমাদের মাথায় একদিন লাঠি মেরেছে, খোকার মুখের ভাত বুটের লাথি দিয়ে ফেলে দিয়ে চাকুরীর উন্নতি করেছে, তারাই আজ স্বাধীন দেশের পুলিসরূপে অশান্তি রক্ষা করছে। পঞ্চাশ টাকার জন্য আত্মহত্যাকে খুন ও খুনকে আত্মহত্যা প্রতিপন্ন করছে, যে হাকিমেরা ব্রিটিশের গোলামী করবার সময় বিচারের নামে চূড়ান্ত অবিচার করেছেন তাঁরাই আজও হাকিমরূপে বিরাজ করছেন; সেই আদালতে সেই কেরাণীকুলই রয়েছে। সেই কালোবাজার সমানে চলেছে—তারা আজ নুন, কাল চিনি লোপাট করে ফেঁপে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে উঠছেন কর্ত্তারা। এ অবস্থায় পুনরায় বিপ্লব অনিবার্য্য। আপনি এদের কাছে কিছু আশা করবেন না স্যার। যদি বাঁচতে চান তা হলে আত্মক্ষমতায়ই বাঁচতে হবে। সাহায্যপ্রার্থী হলে অনাহারেই মরতে হবে।

—আবার বিপ্লব?

—হ্যাঁ, যদি এঁরা জনগণকে ভালবাসতে না পারেন, নিজেদের স্বার্থ ও সুখকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরে থাকেন তবে গণশক্তির বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান সুনিশ্চিত।

অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে কথাগুলি বলিয়াই সত্য যেন হাঁপাইয়া উঠিল। সে দ্রুত নিশ্বাস লইতে লাগিল। মানসিক উত্তেজনা একটু শান্ত হইলে পুনরায় বলিতে লাগিল, কেন? ভারতে অনাবাদী জমির তো অভাব নেই।

বিদেশ থেকে খাদ্য না এনে রেফুজিদের দিয়ে সেই পতিত জমি আবাদ করান যায় না ? তা হলে খাদ্য-সমস্যার সমাধান হতে ‘কত দিন লাগে ? কিন্তু সে সদিচ্ছা কোথায় ? আমরা তাদের চোখে ভিখারী মাত্র। জমিদারের সে জমিতে হাত দিতে ভয় করে না ?

শচীনবাবু কহিলেন, শিশুরাষ্ট্র কত দিকে সামলাবে ? আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি—

সত্য অধিকতর উত্তেজিতভাবে কহিল, শিশুরাষ্ট্র বলেই ত অন্তর্বিপ্লবকে ভয় করা দরকার, এমন ভাবে দেশকে গড়ে তোলা দরকার যাতে বিপ্লবের সুযোগ না থাকে, লোকের মনে অসন্তোষ না জাগে। কিন্তু নিজেদের উদরপূর্ত্তি করতে গিয়ে এরা আর পুঁজিবাদীরা এমন অসন্তোষের বহ্নি জ্বালিয়েছে যে মানুষ অতিষ্ঠ এবং অধীর হয়ে উঠেছে। যে বুরোক্রেটিক সরকার একদিন ইংরেজের হ’য়ে দেশের বক্ষরক্ত পান ক’রেছে তারা আজও সেইখানেই আছে—সেইখানে নিশ্চিন্তে বসে আজ দরিদ্রের বক্ষরক্ত নিঃশেষে পান করছে—আপনি দেখেননি চাকুরীর জন্যে গেলে কি উপেক্ষার সঙ্গে ওরা ব্যবহার করে বাস্তহারা শুনে হাসে। নির্লজ্জ দম্ভের নিষ্ঠুর পরিহাস।

শচীনবাবু প্রশ্ন করিলেন, সে যাক্, আজকাল কি করছ ?

—যা বললাম ওই করছি স্যার। আমাদের অভিযান এই সব দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে। তাদের এই চোরাকারবারলব্ধ টাকা, ঘুষের টাকা ভোগ করতে দেব না। নিজেদের জীবন দিয়েও এই অনাচার প্রতিরোধের চেষ্টা করব। দেশপ্রেমের মূলধন নিয়ে ব্যবসা করতে দেব না—

—বিপ্লব করবে ?

—হ্যাঁ, আপনার অজানা নেই—দিদিমণির কাছে যা ছিল তা এখনও আছে আরও সংগ্রহ করেছি। আমরা বিপ্লব করব, সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচতে আসিনি সংসারে। তাই মরব কিন্তু অন্যায়ের কাছে, অবিচারের

কাছে মাথা নীচু করব না। আপনার মত বিনা প্রতিবাদে অনাহারে মরতে পারব না আমরা। জীবন তুচ্ছ, তা আহুতি দেব আমরা, আমি একা নয়—বহু জন।

—কিন্তু—

—কিন্তু নেই স্যার। আপনার স্ত্রীর রক্তে যে দেশের মাটি রঞ্জিত হয়েছে, সে দেশ আপনাকে কি দিয়েছে? আপনি মরবেন অনাহারে, খোকা ভিখারীর মত অসহায় হবে পৃথিবীতে?

শচীনবাবু চম্‌কাইয়া উঠিলেন—খোকা অসহায় হবে পৃথিবীতে!

উত্তেজনায় কাঁপিতে কাঁপিতে সত্য উঠিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ আপনার তালুতে মুষ্টির আঘাত করিয়া কহিল, প্রতিশোধ নেব, অত্যন্ত নির্ম্মম প্রতিশোধ নেব ওই মণিবাবুদের উপর, মাথা নীচু করব না। সেইজন্যেই অঞ্জলিকে···যাবেন, আমাদের ওখানে, দেখবেন কত ব্যাপক আমাদের আয়োজন।

সত্য উন্মাদের মত দ্রুতপদে চলিয়া গেল, একবারও পিছন পানে চাহিল না। সশব্দে গেটের দরজাটা ঠেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। শচীনবাবু সবিস্ময়ে তাহার গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই সেই সত্য! শান্ত স্থির সমবেদনাকাতর সদাহাস্যময় সত্য! এ কি হইয়া উঠিয়াছে। ও যেন উন্মত্ত প্রলয়ঝটিকা বুকের ভিতর চাপিয়া রাখিয়া হাঁপাইতেছে।

*

শচীনবাবু ধীরে ধীরে উঠিয়া ট্রামের পয়সা বাঁচাইবার জন্য হাঁটিয়াই হাওড়া রওনা হইলেন। সত্যর এতগুলি উত্তেজনাপূর্ণ কথার কোনটিই তাঁহার হৃদয়কে দোলা দেয় নাই কিন্তু একটা কথা তাঁহার অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনাকে যেন উন্মথিত করিয়া দিয়াছে। তাহার মৃত্যুর পরে

খোকা হইবে ভিখারীর মত অসহায়! সত্যই ত আজ যদি আকস্মিক ভাবে তাহার মৃত্যুই হয় তবে মীরার এত আদরের খোকা কোথায় দাঁড়াইবে! কোথায় যাইবে, তাহার অবর্ত্তমানে খোকার কি গতি হইবে। তাঁহার চোখ দুইটি বার বার জলে ভরিয়া উঠিতেছিল।

অন্যমনস্কভাবে সেকথা ভাবিতে ভাবিতে পথ চলিতেছিলেন। একখানা মোটর প্রায় তাঁহার গা ঘেঁসিয়া যাইতেই তিনি চমকাইয়া উঠিলেন। এমনি করিয়া অকস্মাৎ যদি মোটর চাপা পড়েন!

শচীনবাবু আর ভাবিতে পারেন না—

এক জন বাস্তুত্যাগী ভিক্ষার্থী ট্রেনে ভিক্ষা করিতেছিল। শচীনবাবুর মনে হইল তিনিও যেন ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন, খোকা অনাহারে রহিয়াছে।

সত্যর কথা কয়টি ক্রমাগত তাঁহার মনে আনাগোনা করিতেছিল, তদুপরি যে মোটরটি তাঁহার গা ঘেঁসিয়া চলিয়া গেল সেটি যেন ভাবী অশুভ ঘটনার আভাস দিয়া গেল। ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অন্তরের বেদনার ভার গুরুতর হইয়া উঠিতেছিল। কোনমতেই তিনি তাহাকে চাপিয়া আত্মস্থ হইতে পারিতেছিলেন না—বার বার চোখ ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল···

সহসা তাঁহার মনে হইল, বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, সৎ অসৎ যে কোন উপায়ে হোক্ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। খোকাকে এমনি অনুদার পৃথিবীতে একাকী ফেলিয়া কোনমতেই অকালে মরা যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, বাঁচিতেই হইবে। সত্যদের বৈপ্লবিক কার্য্যের সহায়ক হইয়াও বাঁচিতে হইবে। তিনি কোনমতেই মরিতে পারেন না। অন্যায়ের কাছে মাথা নত না করিয়া তাঁহাকে বাঁচিতেই হইবে।

শচীনবাবু নিঃশব্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এক দিকে মহেশবাবুর সেই প্রজা ও স্থানীয় বাবুরা অসহায় দরিদ্রদের শোষণ করিয়া নিজেদের উদর স্ফীত করিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না, অন্য দিকে সত্য উন্মাদের মত ছুটিয়াছে কাহার আহ্বানে কে জানে! তাহার মত পতঙ্গধর্ম্মীরা আদর্শের আগুনে নিজেদের পোড়াইয়া ভস্ম করিতেছে, আর অন্যেরা সেই ভস্ম অঙ্গে মাখিয়া উৎসব করিতেছে বাস্তব পৃথিবীর অনুদার আঙ্গিনায়। এই পৃথিবী! ইহাই পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস।

শচীনবাবু দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া বাহিরের ঘনীভূত অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিলেন।

*

আরও একমাস পরের কথা।

তিনি চাক্‌রির জন্য কয়েকখানি দরখাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একটিতে ফল হইল। বর্ত্তমানে নিকটেই একটি স্কুলে তিনি একটি মাষ্টারী পাইয়াছেন, বেতন ৫০৲ টাকা, একটি টিউসনিও জুটিয়াছে; স্কুলের পরে পড়াইয়া আসেন, তাহাতে রোজগার হয় ১৫৲ টাকা। বাড়ীভাড়া দিলে বাকী চল্লিশ টাকায় দুই জনের কোনমতে চলিতে পারে।

কয়েক মাসে হাতের জমানো টাকা প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল। কয়েকটি মাত্র টাকা ছিল তাই দিয়া টায়টোয় মাসের কয়েকটি দিন কাটাইতে হইবে তারপরেই মাহিনা পাইবেন। দিন একরূপ চলিয়া যাইবে। টিউসনি দুই একটা পাইলে ভালই চলিবে।

তাঁহাকে যাইতে হয় গাড়ীতে, মাসিক টিকিট আছে কিন্তু এদিক ওদিক দুই মাইল হাঁটিতে হয়, তাহাতে ক্লান্তি আসে। সকালে তাড়াতাড়ি রাঁধিয়া খাইয়া ৯টায় গাড়ী ধরেন, বৈকালে ৭টায় ফেরেন। খোকা আনমনে খেলা করিয়া বেড়ায়; একটু পড়াশুনাও করে।

বর্ষাকাল। বেশী বৃষ্টি হইলে ফাটলধরা ছাদ দিয়া জল পড়ে, সারারাত্রি বিছানা এদিক ওদিক টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়। গতরাত্রি তাই শচীনবাবুর ঘুম হয় নাই, ঘরের মাঝে ছাতা মাথায় দিয়া বসিয়াছিলেন।

সকালে যৎসামান্য কিছু রাঁধিয়া ও বৈকালের রুটি তৈয়ারী করিয়া রাখিয়া তিনি নয়টায় গাড়ী ধরিয়াছেন। মাঝে মাঝে বৃষ্টি, আর ভাপসা গরমে শরীরে একটা অস্বস্তি বোধ কবিতেছিলেন। গাড়ীতে বসিয়া হিসাব করিয়া দেখিলেন, বৈকালে যাহা তিনি খান তাহাতে অত্যধিক খরচ হইতেছে, এত পয়সা খরচ করিলে চলিবে না।

বৈকালে চায়ের দোকানে যাইবার পথে দেখিলেন বেগুনি ফুলুরীর দোকান, বেশ সস্তায় পেট ভরে, তিনি চার পয়সাব বেগুনি খাইয়া ও চা পান করিয়া পড়াইতে গেলেন।

ফিরিবার মুখে পেটে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। ষ্টেশনে নামিয়া আষাঢের অশ্রান্ত বর্ষণে ভিজিয়া কোনমতে বাসায় পৌছিলেন, কিন্তু এত দুর্ব্বল বোধ করিতে লাগিলেন যে তাঁহাব যেন দম বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।

বর্ষণে ঘর ভিজিয়া গিয়াছে, বিছানা পাতিবার স্থান নাই। খোকা ছাতা মাথায় দিয়া লণ্ঠন জ্বালাইয়া একাকী বসিয়া আছে নির্ভীক ভাবে। আজ কোন আত্মীয় আর আসেন নাই খোঁজ করিতে, এমনি বর্ষণে বাহির হওয়া যায় না।

শচীনবাবু বলিলেন, খোকা, বড্ড পেটে অসুখ করেছে, তুই রুটি দুখানা খেয়ে শুয়ে পড়, আমি রাত্রে আর খাব না।

ঘরের যে স্থানটি অপেক্ষাকৃত শুষ্ক সেই স্থানটায় সংক্ষিপ্ত বিছানা পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন, খোকা গুড় রুটি খাইয়া একপাশে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাহিরে গাঢ় অন্ধকার, ঘন বর্ষণের শব্দ ভাসিয়া আসিতেছে, মাঝে মাঝে বাতাসের গর্জ্জন—সমস্ত গ্রাম নিঝুম, যেন অন্ধকার-সমুদ্রের তলদেশে ঘুমাইয়া আছে। কিছুক্ষণ বাদে শচীনবাবু শরীরে একটা অসম্ভব জ্বালা অনুভব করিতে লাগিলেন, সারা দেহের ভিতরে বাহিরে লঙ্কাবাটা লাগাইয়া দিয়াছে। হাতে পায়ে খিল ধরিয়া যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে অপরিসীম অব্যক্ত যন্ত্রণা।

শচীনবাবু সম্ভবতঃ অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলেন, জাগিয়া অনুভব করিলেন ছাদ হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে। জলের ছাটে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি একটু সরিয়া শুইতে চেষ্টা করিলেন—কিন্তু পারিলেন না, হাত-পা অবশ অশক্ত হইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তিনি কি মরিতে বসিয়াছেন! সঙ্গে সঙ্গে অজস্র অশ্রুধারায় গণ্ড ভাসিয়া গেল, খোকা, অসহায় নিঃসম্বল। ও জগতে কেমন করিয়া বাঁচিবে? ওর যে আর কেহ নাই।

খোকাকে ডাকিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কণ্ঠ রুদ্ধ, ডাকিবার শক্তি নাই। পরক্ষণে ভাবিলেন, থাক্, ঘুমাইয়া থাক্, যদি তিনি মরিয়াই যান তবে নিশীথ রাত্রের এই অন্ধকারে মাতৃহীন শিশু ভয়ে ভাবনায় অসাড় হইয়া যাইবে, কেমন করিয়া মৃত পিতাকে লইয়া ও রাত্রি কাটাইবে। এই দুর্য্যোগে কোথায় যাইবে!

—হায়! হায়! এই কি তাঁহার জীবনের শেষ, এমনি করিয়া তাঁহার আদরের খোকাকে তিনি পথের ভিখারী করিয়া চলিয়া যাইবেন। তিনি একান্ত মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—ভগবান কয়েকটি বৎসর আমায় পরমায়ু ভিক্ষা দাও। আমার নিজের জন্য নয়—খোকার জন্য, মীরার জন্য, যে মীরা ভারতের স্বাধীনতার জন্য মরিয়াছে।

বুকের উপর টপ টপ করিয়া জল পড়িতেছে, হিমশীতল দেহকে নাড়িবার ক্ষমতা নাই তাঁহার। প্রাণপণ শক্তিতে তিনি ডাকিতে

চেষ্টা করিলেন, খোকা! কিন্তু কণ্ঠস্বর চিরদিনের মত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, দেহ চিরতরে নিষ্ক্রিয়, নির্জ্জীব, অসাড়।

ভোরবেলা বাদলের মাতন থামিয়াছে—

পূবের আকাশ পরিষ্কার, খোলা জানালা দিয়া আলো আসিয়াছে, ঘরের মাঝে স্পষ্ট দেখা যায়। পাখীরা ভিজা ডানা ঝাড়িয়া ডাকিতেছে। খোকা জাগিয়াছে—কিন্তু বিছানা ভিজা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল। আপনমনেই কহিল, সব ভিজে গেছে—

ডাকিল, বাবা! বাবা!

পিতা উত্তর দিলেন না। সে উবু হইয়া বসিয়া ডাকিল, বাবা!

পিতা নিরুত্তর।

বাবা কেমন করিয়া তাকাইয়া আছে, দেখিলে ভয় হয়, চোখ দুইটি যেন যাতনায় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোখেব কোণে গালেব উপরে অশ্রুর দাগ শুকাইয়া রহিয়াছে।

খোকা কহিল, বাবা কাঁদছ কেন? বাবা!

কোন উত্তর নাই। খোকা তাঁহার গায়ে একটা ধাক্কা দিল, দেহ হিমশীতল, বাবা কথা বলে না, কেমন করিযা যেন তাকাইয়া আছে।

ভয়ে দুঃখে খোকা কাঁদিয়া ফেলিল।

চোখ মুছিয়া দেখে বাহিরে সুস্পষ্ট দিনের আলোক! একটি অজানা ভয় ও দুর্জ্ঞেয় অস্বস্তিতে সে বাহিরে আসিল, বৃষ্টিধৌত আলোকিত রাস্তা, সে তাহাই বাহিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। তার পর বড় রাস্তা। বড় রাস্তায় কত গাড়ী চলিয়াছে। সে চারি পাশের ঘরবাড়ী, গাড়ী, যানবাহন দেখিতে দেখিতে চলিতে লাগিল। সুন্দর, রঙীন গাড়ী, দো তলা তিন তলা বাড়ী, বড় বড় গাছ, রাশি রাশি তার কত দূরে গিয়াছে;—কত দূর···

আপন খেয়ালে চলিতে চলিতে সে আসিল একটা স্থানে—বিরাট ঘর,

বহু লোকজন। রেলের গাড়ী হুস্ হুস্ করিয়া আসিয়া চলিয়া গেল। কত বড় গাড়ী, কত বেগে যাইতেছে, মাটি কাঁপিয়া উঠিতেছে এত তার শক্তি।

খোকা একখানা বেঞ্চিতে বসিয়া দেখিতে লাগিল।...

একখানা গাড়ী আসিল, সকলে ছুটাছুটি করিয়া গাড়ীতে উঠিতেছে। মজার ব্যাপার, অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে সেও গাড়ীতে উঠিয়া পড়িল। গাড়ী গড় গড় করিয়া চলিবে—কি আনন্দ, কি মজা!

*

গাড়ী চলিয়াছে—বন, মাঠ, গ্রাম, শহর অতিক্রম করিয়া। খোকা জানালায় বসিয়া মুগ্ধ বিস্ময়ে চাহিয়া দেখে—গাছ ছুটিয়াছে, মাঠ ছুটিয়াছে গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া...

কিন্তু ক্ষুধা পাইয়াছে বেজায়, কাল রাত্রিতে দুইখানি মাত্র রুটি খাইয়াছে সে। এখন বেলা হইয়াছে। কে একজন হাঁকিতেছে, চানাচুর,—গরম গরম—

খোকা লুব্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। লোকে এক-এক আনা দিয়া কিনিয়া তাহারই সামনে বসিয়া খাইতে লাগিল। পাশের লোকটি বসিয়া চোখ বুজিয়া চিবাইতেছে, দাঁতে দাঁতে কট্‌মট্ শব্দ হইতেছে।

খোকা কহিল, আমায় চারটা পয়সা দেবেন—ঐ খাবো—

খোকার ভাষায় দেশজ টান ছিল। একজন যাত্রী বলিল, না, এই রিফুজিগুলোর জন্যে আর চলা যায় না। পথে-ঘাটে সব জায়গায় ভিক্ষে—চাকুরী মিল্‌বে না,—মাছের দাম বেড়ে গেল—

খোকা সবিস্ময়ে তাকাইয়া রহিল। লোকটা কি বলিল, সে বুঝিতে পারে নাই। অন্য ব্যক্তি কহিল, ওঁরা এসেছেন দয়া করে—এখন মাথায় করে রাখো। গাড়ীতে চলবার যো নেই, পথে চলার যো নেই...তিনি আরো কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু এক ভদ্রলোক বাধা দিলেন। তিনি একটি চানাচুরের প্যাকেট কিনিয়া খোকার হাতে দিলেন, খোকা তাহা

চিবাইতে চিবাইতে জানালার বাহিরে তাকাইয়া ধাবমান গাছপালা দেখিতে লাগিল, কৌতুকভরে—পরম বিস্ময়ে—

ওদিকে রেফুজি সমস্যা লইয়া দুই ভদ্রলোকের মধ্যে বচসা সুরু হইয়াছে। কোন গোলমাল নাই—দেশ ছাড়িয়া আসার দরকার কি?

খোকার এসবে আগ্রহ ছিল না। সে কিছু বুঝিতে পাবে না। সে জানালার কাছে ঘন হইয়া বসিল। সম্মুখে উদার মাঠ, উন্মুক্ত প্রান্তর—ধাবমান বৃক্ষশ্রেণী!

পৃথিবী ঘুরিতেছে আপন অক্ষের উপর—অবিরাম, অশ্রান্ত গতিতে।

গতির সঙ্গে পৃথিবীর ইতিহাসে যুক্ত হইতেছে সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ভাঙ্গা-গড়ার অনন্ত কাহিনী। মানুষের বুকের রক্তে সিক্ত হইতেছে পৃথিবীর উষর মৃত্তিকা, মানুষ বিত্ত অর্জ্জন করিতেছে, সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছে। যারা পতঙ্গধর্ম্মী তারা ছুটিয়া চলিয়াছে আদর্শের ভাস্বর বহ্নিশিখার পানে—তাহারা নিজেরা পুড়িযা, পোড়াইয়া পৃথিবীকে দিতেছে আবর্ত্তনের শক্তি। পৃথিবী ঘুরিতেছে, তাহাদের বুকের রক্তে উর্ব্বর হইতেছে ধূসর মৃত্তিকা, শ্যামল হইতেছে পাণ্ডুর মাঠ। ভস্মীভূত পতঙ্গ-স্তূপের উপর যুগে যুগে উঠিয়াছে মণিবাবুদেব মর্ম্মর প্রাসাদ। এমনি করিয়া গিয়াছে মীরা, শচীনবাবু। সত্য ছুটিয়াছে সম্মুখের পানে পৃথিবীব উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করিতে···ভবিষ্যৎকে সুন্দর করিতে ··ভাবীকালের আদর্শকে জয়যুক্ত করিতে।

পৃথিবী ছুটিয়াছে—বিপ্লবের রক্তময় ইতিহাসকে পাথেয় লইয়া।

জানি না এই অনুদার নিষ্ঠুর স্বার্থান্ধ পৃথিবীর বুকে খোকা আজও বাঁচিয়া আছে কি-না।

সমাপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬